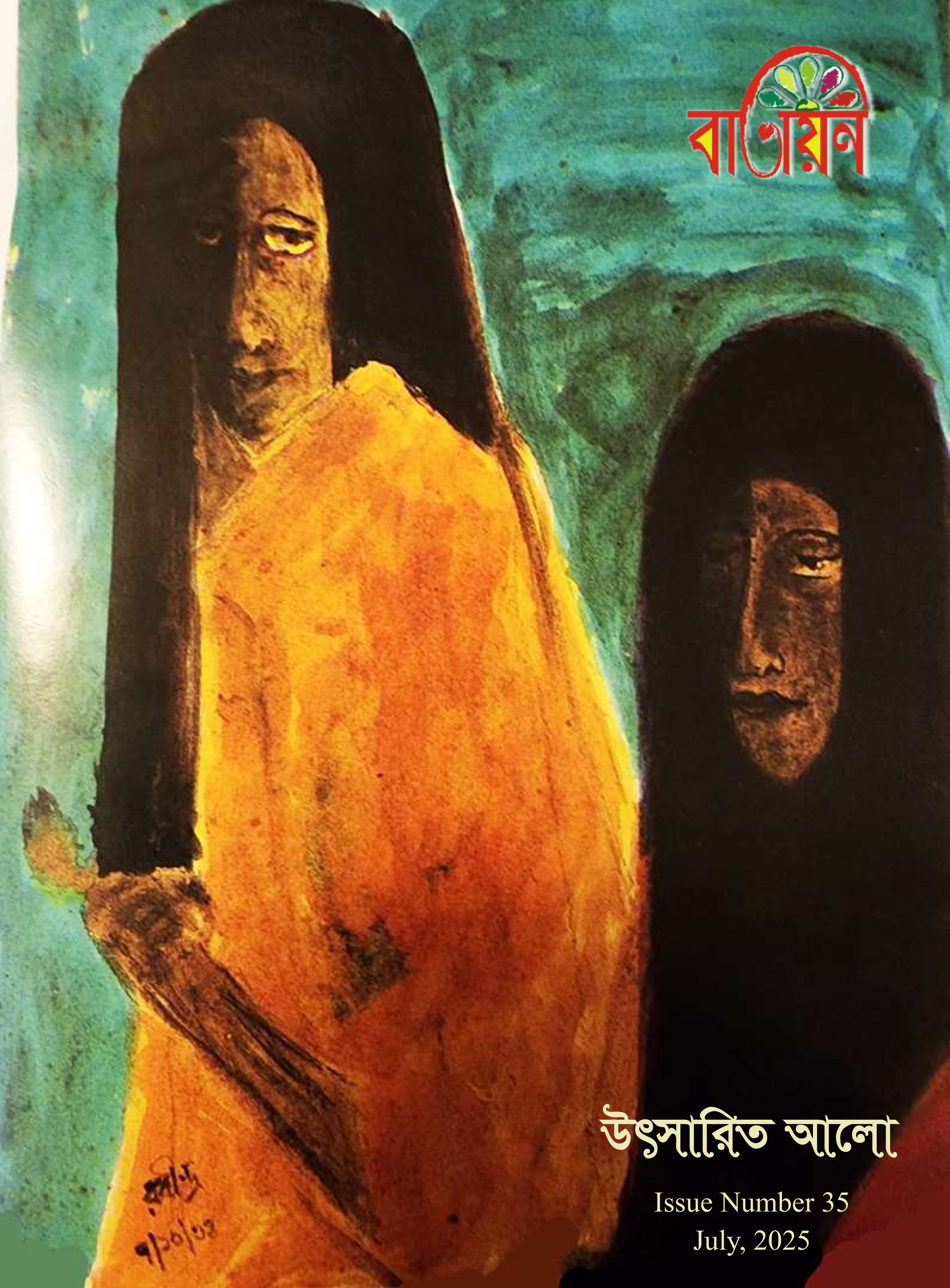

বাতায়ন

উৎসারিত আলো

Issue Number 35
July, 2025

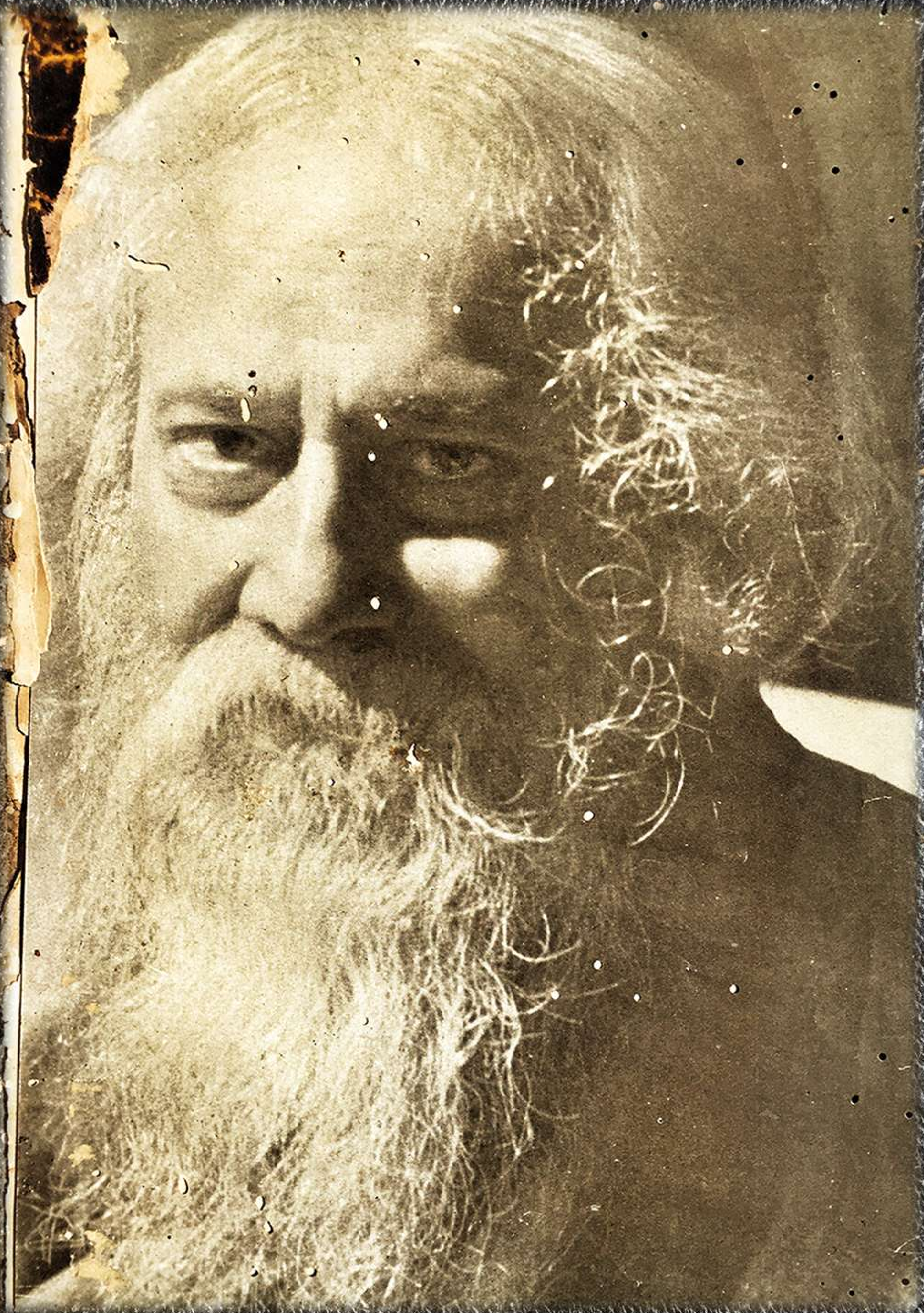

Bataan

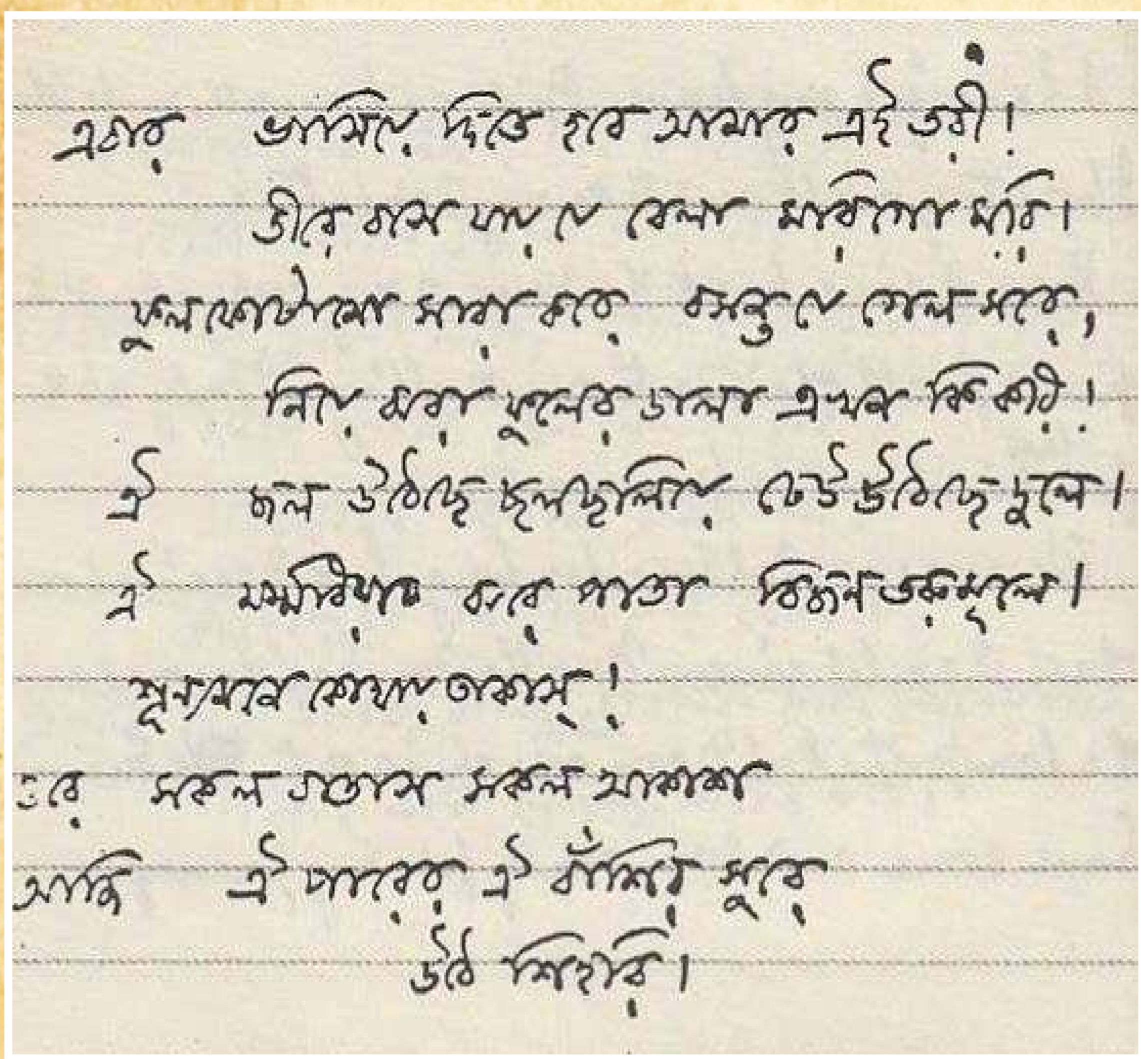

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে বসে যায় যে বেলা মরি গো মরি।
ফুলফোটানো সারা করে বসন্ত যে গেল সরে,
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা এখন কী করি।
ঐ জল উঠেছে ছলছলিয়ে ঢেউ উঠেছে দুলে।
ঐ মর্মরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তরুমূলে।
শূন্যমনে কোথায় তাকাস্!
ওরে সকল বাতাস সকল আকাশ
আজি ঐ পারের ঐ বাঁশির সুরে
উঠে শিহরি।

Chief Editor : Ranjita Chattopadhyay

Volume 35 | July, 2025

A literary magazine with an International reach

Issue Number 35 : July, 2025

ISBN: 978-1-7641232-1-1

Chief Editor
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA

Sub Editor
Sugandha Pramanik
Sydney, Australia

Design & Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Support
Susanta Nandi, Kolkata, India

CEO
Anusri Banerjee
Perth, Australia
neospectrum58@gmail.com

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registration No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Photo Credit

Front Cover

Painting by Rabindranath Tagore,
collected from Thakurbarir Chitrakala,
Dey's Publishing

Inside Front Cover

This Photograph of Rabindranath Tagore
was taken by Swiss Photographer & Artist
Raymond Burnier

Source: Rabindra Jibani
by
Shri Prabhat Kumar Mukhopadhyay, 1st edition - 1956

Inside Back Cover

Sketch of Rabindranath Tagore
by
eminent Bengali artist Shri Jogen Chowdhury
Batayan ("Prabhu Amar")

Back Cover

From
Gitanjali (Song Offerings)
by
Rabindranath Tagore

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

"নিজের রোগ ও দুর্বলতাকে বিশ্বাস না করাই ভাল। তাদের অস্তিত্ব সংসারে আছে, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব শুধু দেহে-মনে নয়। মনের রোগ হচ্ছে আধি, অর্থাৎ কাজের ঝঞ্ঝাট, তার থেকেও বেশী অকাজের ঝঞ্ঝাট, সেটাই আমাকে থেকে থেকে মারচে। কিন্তু পাঁক বাদ দিয়ে চিংড়িমাছ ধরা চলবে না – তাই কোমর বেঁধে নিজেকে প্রায়ই বলি, 'রবীন্দ্রনাথ, ঝঞ্ঝাট জিনিসটা নোংরা কিন্তু সেটা আসল জিনিস নয় – প্রদীপের তেলটা গায়ে মেখো না, কিন্তু আলো জ্বলুক, তারপর প্রতিদিন সাফ করতে হবে দীপটা, ভয় কি, আলোর মূল্যে তার মাইনে উঠে যাবে – অকাজের চেয়ে কাজের ঝঞ্ঝাটও ভালো।" ৭ই আশ্বিন, ১৩৩৫ – নির্মলকুমারী মহলানবীশকে একটি চিঠিতে এই কথাগুলি লেখেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর জীবন ও বাণীর এটাই মূলমন্ত্র। অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত যে আলো তারই খোঁজের নির্দেশ তাঁর বিপুল রচনাসম্ভারে।

প্রত্যেক বছরের মতো এবারেও পার হল রবীন্দ্রজয়ন্তী। উৎসব হল নানা জায়গায়। তাঁর গানে, কবিতায় ও অন্যান্য সৃষ্টিতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাল বিশ্বজোড়া বাঙালী। এই উপলক্ষ্যে কিছু অতি প্রচলিত শ্রদ্ধার্ঘ্যের ডালিও যে সেজে ওঠে নি তা নয়। তবে তা এড়িয়ে যাওয়ার উপায়ও তেমন নেই। আর ক্ষতিও নেই কোন। বহু ব্যবহারেও পুরনো হয় না তাঁর বাণী। ঘুরেফিরে যতবারই দেখা হোক সেসব হীরকখণ্ড থেকে সমানেই বিচ্ছুরিত হয় আলো।

বিষয় রবীন্দ্রনাথ, – সাগরের মতো অসীম। মহাকাশের মতো ব্যাপ্তি বিষয়টির। বাঙালী জীবনে রবীন্দ্রনাথ তো ব্যক্তি নন আজ। তিনি একটি সমগ্র বিষয়। তাই তাঁকে স্মরণ করতে গেলে মনে অনেক চিন্তাই এসে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের জীবন, তাঁর বিপুল সাহিত্যসৃষ্টি, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে তাঁর ভাবনা, শিক্ষার আদর্শ, দেশপ্রেম, নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, – ইত্যাদি বহু বিষয়েই বহু আলোচনা হয়েও বাকী আছে অনেক। আর এখানেই রবীন্দ্রচর্চার বিশেষত্ব। তাঁকে নিয়ে বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা যেমন লিখছেন, তেমনই সাধারণ মানুষেরাও তাঁদের নিজেদের মতো করে ভাবছেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। অন্তরের শ্রদ্ধা আর ভালবাসা মিশিয়ে প্রকাশ করছেন মনের কথা। 'বাতায়ন রবীন্দ্রসংখ্যা' এইসব মানুষদের রবীন্দ্র ভাবনার ফসল।

একইসঙ্গে আর একটা কথাও ভেবে দেখার আছে। রবীন্দ্রনাথ মানে কি শুধুই ভাবালুতা তাহলে? বিশেষ একরকমের আবেগই তো আমার (আমাদের) একমাত্র রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার নয়। রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গে এসে পড়ে সমাজ – সংস্কৃতির উত্তরাধিকার, শিল্প সাহিত্যের উত্তরাধিকার, এমনকি রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের বিষয়টাও অপ্রাসঙ্গিক নয়। আর এই উত্তরাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা দায়ও আমাদের ওপর এসে বর্তায়। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এই যে রবীন্দ্রসম্পদ তাকে রক্ষা করার জন্যে সচেষ্ট হতে হবে। চেষ্টা করতে হবে তাকে সমৃদ্ধ করার জন্যে। আর এই কাজের যোগ্য হতে গিয়েই মানুষ হিসেবে উত্তোরণের পথ খুঁজে চলা। তাই নিছক ভাবালুতা নয় – রবীন্দ্ররচনা থেকে পাই আত্মশক্তি। মুক্তধারা নাটকে ধনঞ্জয় শিবতরাই মানুষজনকে একটা বার্তা দেন, "আমার জোরেই তোদের জোর ? এ কথা যদি বলিস তাহলে যে আমাকে সুদ্ধ দুর্বল করবি।" কবিগুরুর জীবনী পাঠ করলে দেখতে পাই তাঁর জীবনসাধনার মূলমন্ত্রটি ছিল আত্মশক্তি। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়েই তিনি জীবনব্যাপী দুরূহ ও বিপুল কর্মকাণ্ডের ছিলেন হোতা। তাঁর কাছে তাই এই হয়ে ওঠার ব্রতে দীক্ষা।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের **৭**ই মে জোড়াসাঁকোর সুবিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্ম রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রশতবর্ষের সময় থেকে শুরু করে গত পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর ধরে রবীন্দ্রচর্চায় একধরণের নতুন উদ্দীপনা ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর গান-নাচ -আবৃত্তি-নাটক ইত্যাদি নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। প্রচুর গবেষণা হচ্ছে তাঁর গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-উপন্যাস নিয়ে। এ সবই আশার কথা। সমগ্র বিশ্বেই আজ এক বিপন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতি। এর প্রেক্ষিতে রাবীন্দ্রিক পরিবেশ চিন্তা ও পারস্পরিক মৈত্রীর বাণী উত্তরোত্তর প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। এ এক বড়ো ভরসার কথা। এরই পাশাপাশি তাঁর উত্তরাধিকার বহনের চিন্তাটাও আসে মনে। রবীন্দ্রদর্শনের সঙ্গে আন্তরিক বোঝাপড়ার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াটাও রবীন্দ্রচর্চার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। সেদিক থেকে মনোযোগ যেন সরে না যায়। আমাদের প্রাত্যহিক দিনযাপনে, আমাদের বিশ্বাস ও চিন্তার জগতে, আমাদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ভুবনে আমরা যেন নিয়ত তাঁর শুভচেতনা, সংযোগ ও সংহতির আদর্শ অনুসরণ করতে পারি।

কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে বাতায়ন রবীন্দ্রসংখ্যার প্রকাশ। পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত সকলকে, যাঁরা লেখা দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে এবং পত্রিকার পাঠকবন্ধুদের প্রতি রইল আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

রবীন্দ্রচর্চা ও রবীন্দ্রভাবনায় কাটুক আগামী দিনগুলি।

শুভেচ্ছান্তে,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, বাতায়ন পত্রিকা গোষ্ঠী

সূচিপত্র

যশোধরা রায়চৌধুরী	**রবি ঠাকুরের জন্য প্রেমপত্র**	10
স্নিগ্ধা সেন	**কেন রক্তপাত**	12
ইন্দিরা চন্দ	**পথভোলা**	13
তপনজ্যোতি মিত্র	**কবির ঘর**	14
রক্তকরবী প্রসঙ্গে – "রক্তকরবী" শতবর্ষে –		(17-22)
স্বর্ভানু সান্যাল		17
দেবীপ্রিয়া রায়	**আমার চোখে রক্তকরবী**	18
Indrani Mondal	**Rakto Karobi – A Persistent, Modern Dilemma – Thoughts then and Now**	21
সঞ্জয় ব্যানার্জ্জী	**হে মহাজীবন, হে মহামরণ**	23
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়	**বাঙালির বিশ্বপরিচয়**	36
দীপেশ চক্রবর্তী	**রবীন্দ্রনাথ : একটি গান জীবনে ও যাপনে**	39
সৌমিক বসু	**গানের ওপারে**	42
ভজেন্দ্র বর্মন	**নিমন্ত্রণ বিভ্রাট**	45
দেবীকা ব্যানার্জ্জী	**জীবন, ঋতু ও রবীন্দ্রনাথ**	51
শাশ্বতী বসু	**চন্ডালিনী**	54
সুজয় দত্ত	**আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী**	59
অন্বেষা দত্ত	**কবির পোশাক চিন্তন**	64
সুরজিৎ রায়	**আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশচিন্তা ও রবীন্দ্রগান**	67
পারিজাত ব্যানার্জী	**শ্রাবণের ধারার মতো**	69
মধুবন চক্রবর্তী	**রবীন্দ্রনাথ, ভাবসঙ্গীত ও রাগের সৌন্দর্য**	73

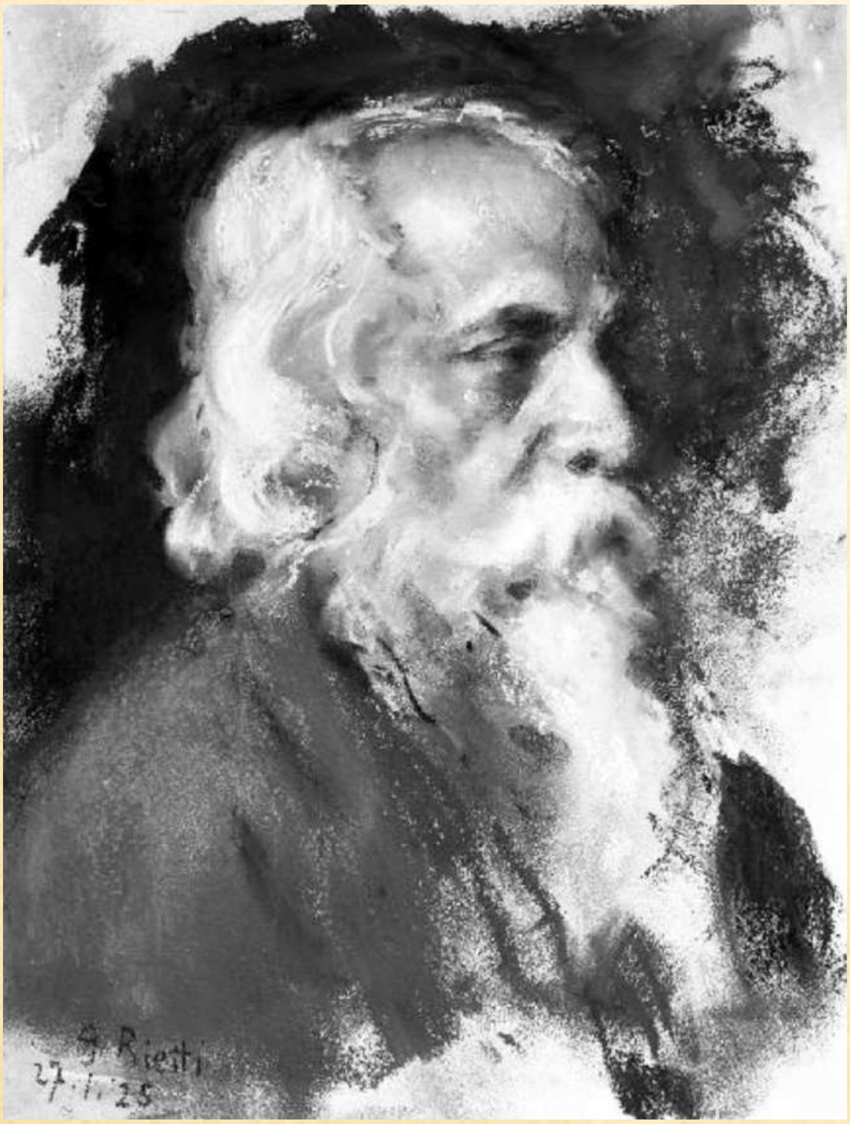

শতবর্ষে Arturo Rietti কৃত কবির আলেখ্য

তথ্যসূত্রঃ “রবীন্দ্রজীবনী” – প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শতবর্ষে Arturo Rietti কৃত কবির আলেখ্য।

তথ্যসূত্রঃ রবীন্দ্রজীবনী তৃতীয় খণ্ড (২০১০-১১। পৃ. ২২৮-২৩২) – প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় – বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

Arturo Rietti-র (১৮৬৩-১৯৪৩) পরিচয় বিশ্বতথ্যকোষ (website)-এ সহজলভ্য।

এই সূত্রে আলোকচিত্রকর Emilio Sommariva-র (১৮৮৩-১৯৫৬) নামও স্বীকার করি, যাঁর আলোকচিত্র-র জন্য আমরা Rietti-র সৃষ্টি উপভোগ করছি। এই দুই কৃতী শিল্পীর প্রভাব এবং কর্মক্ষেত্র উত্তর ও উত্তরপূর্ব ইতালী-র Milan/Lodi/Trieste অঞ্চলে।

রবীন্দ্রজীবনী-তে প্রভাতকুমার লিখেছেন, যে রবীন্দ্রনাথ ২১ জানুয়ারী থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫-এ ইতালী-তে থাকেন। "রবীন্দ্রনাথকে ইতালীয় জনতা আগ্রহের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল; কিন্তু সরকারি মহল কবি সম্বন্ধে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করে নাই।" তখন ইতালী-র কর্তা মুসোলিনী। Milan শহরেই রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সময় কাটে – সভা, সংবর্ধনা ও কথোপকথনের ব্যস্ততায় দিন কাটে। প্রভাতকুমার লিখেছেন, Milan-এর Duchy (duke) Scottie-এর প্রাসাদে Rietti এই চিত্র আঁকেন। তারিখ ছবিতেই লিখিত, যদিও প্রভাতকুমারের বর্ণনায় ২৩ জানুয়ারী Milan-এর People's Theatre প্রেক্ষাগৃহে কবি-সংবর্ধনার আনন্দ-মুখরিত সভার পর অপরাহ্ণে এই আলেখ্য Rietti তৈরী করেন।।

Milan শহরে ভ্রমণে গেলে, আগ্রহী জন সম্ভবত Sommariva-কৃত আলোকচিত্র-টি দেখতে পাবেন – Braidense National Library , Sommariva collection , SOM. ST. D. a. 522.

Rietti-কৃত মূল প্রতিকৃতি-টি কোথায় আছে কেউ যদি জানেন, তা' জানাবেন।

২০০৮ নাগাদ Fondazione CRTrieste-দ্বারা প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় ছবিটির উল্লেখ পাওয়া যায়। পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু Arturo Rietti; লেখক-তথা-গবেষক – Maurizio Lorber।

লেখক উল্লেখ করেছেন, যে মূল চিত্রটির অবস্থান অজানা; হয়তো কোনো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সংগ্রহে আছে, যদিও তা' কেবলই অনুমান। সেই জায়গাটি Napoli (Naples) হ'তেও পারে। তা-ও সঠিক জানা নেই। আরও লেখা আছে, যে ছবিটি সৃষ্টির উপলক্ষ্যটি জানা সহজসাধ্য নয়।

আজও যদি ছবিটির ঠিকানা অজানা হয়, আশা করবো, প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনীর তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ কোনো সম্ভাব্য গবেষণা ও অনুসন্ধানের সূত্রপাত করবে।

লিখনঃ সুপ্রতীক মুখোপাধ্যায়

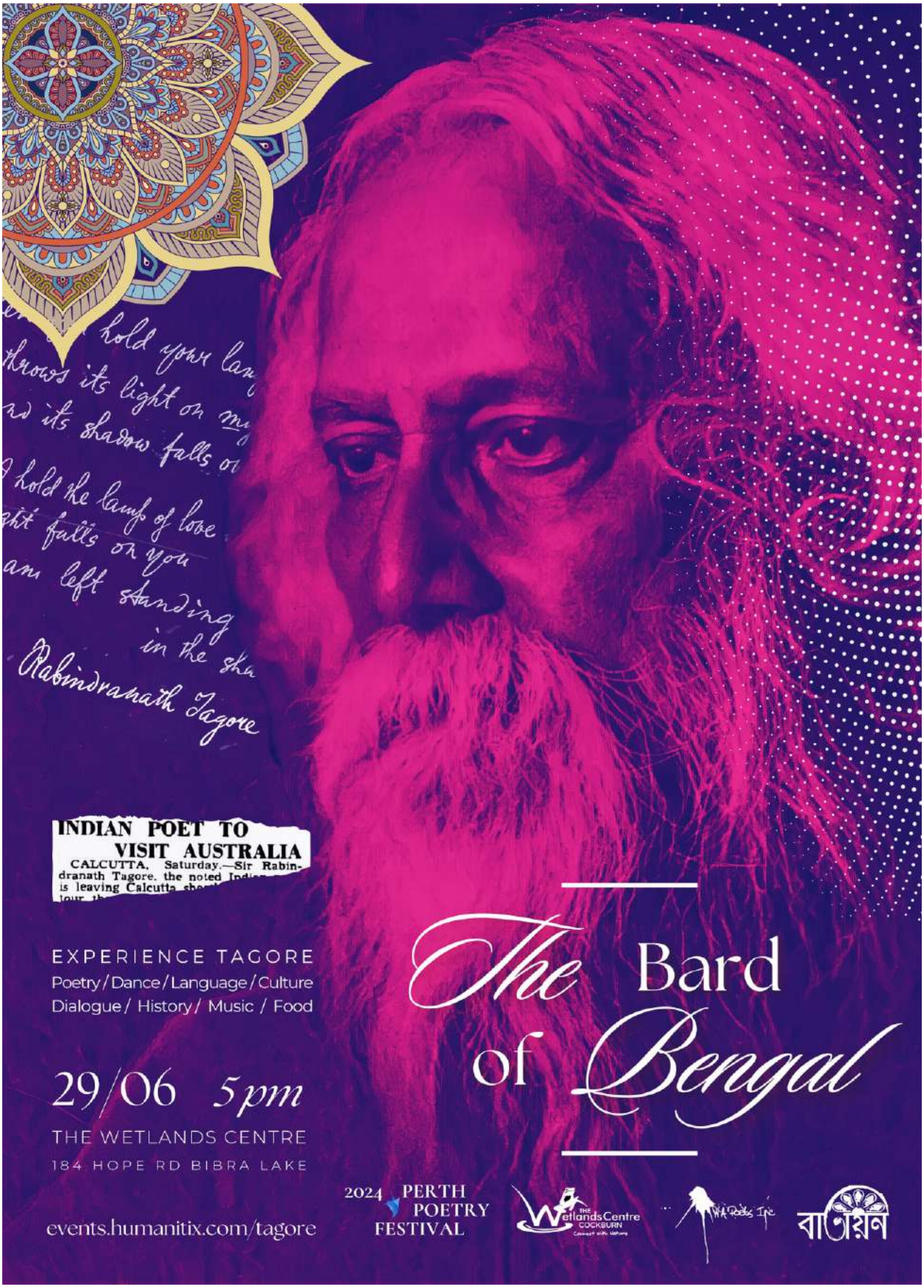
hold your lan
throws its light on m
its shadow falls o
hold the lamp of love
falls on you
am left standing
in the sha
Rabindranath Tagore
INDIAN POET TO
VISIT AUSTRALIA
CALCUTTA, Saturday.—Sir Rabindranath Tagore, the noted
is leaving Calcutta
EXPERIENCE TAGORE
Poetry / Dance / Language / Culture
Dialogue / History / Music / Food
29/06 5pm
THE WETLANDS CENTRE
184 HOPE RD BIBRA LAKE
events.humanitix.com/tagore
The Bard of Bengal
2024 PERTH POETRY FESTIVAL
The Wetlands Centre COCKBURN
বাতায়ন

The Bard of Bengal – A Tribute to Rabindranath Tagore

Presented by WA Poets Inc & Batayan Inc, Saturday, 29 June 2024 | The Wetlands Centre Cockburn

Last winter, The Wetlands Centre Cockburn became the setting for a luminous cultural gathering as WA Poets Inc and Batayan Inc joined forces to present *The Bard of Bengal*—a heartfelt tribute to the legendary poet, philosopher, and polymath Rabindranath Tagore.

Over 100 guests gathered at the Centre on Saturday, 29 June 2024, to honour Tagore's timeless legacy through poetry, music, dance, and reflection. The atmosphere was vibrant with anticipation, and the program unfolded with a rare blend of artistic depth and cultural intimacy.

The evening opened with a welcome from Ana Terrazas, General Manager of The Wetlands Centre Cockburn, whose words set the tone for a deeply resonant celebration of artistic and cultural exchange. A particularly memorable moment of the evening was the presence of His Worship Mayor Logan Howlett and Mrs. Patricia Howlett, whose attendance underscored the significance of the occasion. The Mayor addressed the gathering with warmth and sincerity, reflecting on Tagore's message of unity and shared humanity.

The event was hosted by *Lakshmi Kanchi*, Chair of WA Poets Inc, who guided the evening with grace and attentiveness. The vote of thanks was delivered by *Anu Banerjee* of Batayan, whose closing remarks reflected the sense of shared pride and joy in bringing this vision to life.

A highlight of the night was the panel discussion featuring *Dennis Haskell*, *Krishna Sen*, and *Srijato Bandyopadhyay* (joining via Zoom from India). Their conversation offered rich, intergenerational perspectives on Tagore's legacy—touching on his poetic influence, humanist philosophy, and continuing relevance across cultures. It was a moment where language, history, and imagination met in dialogue, echoing the global spirit of Tagore himself.

Among the evening's standout moments were:

- **Soulful musical performances** by *Shaouli Shahid* and *Surja Mazhar*, who brought Tagore's songs to life with grace and emotion
- **A rich visual and auditory montage** tracing the poet's extraordinary journey and enduring relevance
- **An immersive virtual tour** of *Shantiniketan* led by *Tanmoy Chakraborty*
- **A Panel discussion** that delved into Tagore's philosophy, poetic vision, and contemporary resonance, featuring *Srijato*, *Krishna Sen*, and *Dennis Haskell*
- **Stirring dance interpretations** by *Humaira-Rahman Barua*, whose choreography embodied the emotional breadth of Tagore's verse
- **Poetic renditions** by *Rachel Hull* and local writers, including readings from *Gitanjali*
- **Light Indian refreshments**, fostering a warm sense of community and shared appreciation

Attendees also had the opportunity to purchase specially imported editions of *Gitanjali*, Tagore's Nobel Prize-winning poetry collection. Copies quickly sold out, attesting to the poet's enduring appeal.

The Bard of Bengal was more than a tribute; it was an act of collective remembrance and cultural transmission. It brought together artists, scholars, and community members in a shared space of reverence, dialogue, and beauty. As Tagore once wrote, "Let your life lightly dance on the edges of Time like dew on the tip of a leaf." This evening did just that.

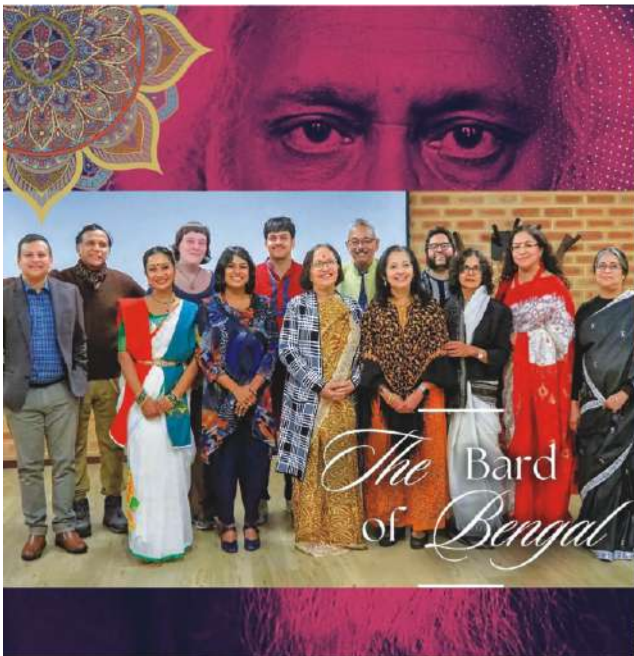
The Bard
of Bengal

যশোধরা রায়চৌধুরী

রবি ঠাকুরের জন্য প্রেমপত্র

বাবু রবি ঠাকুর,
সমীপেষু

(১)

(যখন ভাঙল মিলনমেলা ভাঙল . . .)
আপনাকে দেখেছি আমি বহুদিন ধরে
লন্ডনে বিষণ্ণ সন্ধে, পিয়ানোর টুংটাং মৃদু
বসবার ঘরটিতে আগুন পোহানো
চেয়ারের মসৃণ কাঠের হাতলে
ভারি মাফলারখানি খুলে রেখে হালকা স্বেদের রেখাগুলি
মুখময় লাবণ্য আনত । আপনি কি ঘামতেন
উল্টোদিকে আমাকেই দেখে ?
মসলিন গাউনের ভেতরের হৃদয়ের ধুকুপুকুখানি
আপনি কি জানতেন, না জানলেও চলে যেত তবু
অনেক স্কটিশ গান, ব্যালাডে উচ্ছ্বল সুরারোপে
গুণগুণ সুর ভেঁজে আপনি যে লিখে রাখতেন সেই নোটেশনগুলি
সমৃদ্ধ হবেন বলে, সমৃদ্ধ করবেন বলে পৃথিবীকে, বাঙালি জাতিকে

আপনার হঠাৎ চলে যাওয়া
আমাকে বিপন্ন করল, সূচীমুখ ব্যথা দিল বটে
কিন্তু না-ভোলাখানি আমি তুলে রেখে দিয়েছিনু
গোটানো কার্পেটটুকরো, অনেক রঙ্গিন উল, সূচের ফোঁড়ের সঙ্গে,
আমার গোপন চেস্টে, আখরোট কাঠের ।

আবার কখনো যদি দেখা হয়ে যায় রবিবাবু ?
(হঠাৎ দেখা পথের মাঝে
কান্না তখন থামে না যে . . .)

(২)

(এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে !)
পেনেটির বাগানবাড়িতে, সেই গঙ্গার ধারটিতে একাকী তন্ময়
দেখেছি আপনাকে আমি জোড়াসাঁকো-ছাতে
দেখেছি আড়াল থেকে দু বিনুনি মেয়ের মতন
গান বাঁধছেন আপনি, সুর নিয়ে খেলছেন কত
পায়ে পায়ে কাছে এসে কথা বলব, সাহস হলনা কোনদিন
আপনাকে শুনেছি আমি বারে বারে আপনার প্রাণকাড়া গানে
আমার যৌবনে

আমারও অর্গ্যান ছিল, রবিবাবু, আমারও গানের গলা ছিল
ব্রাহ্ম ভাবধারাখানি আমারও শ্বশুরকুলে ছিল
শ্বশুর মশাই তাঁর আরাম কেদারাতে বসে দু চক্ষু মুদিয়ে
শুনতেন আমার গান, সে গান তো আপনারই, শুধু
(আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে,
বসন্তের বাতাসটুকুর মত . . .)

শেষবার আপনাকে গাই আমার স্বামীর মৃত্যুকালে
আশি পেরনোর পর কাঁপা কাঁপা গলাটি আমার
(মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও . . .)
আমার স্বামীর হাত এগিয়ে এসেছে
(হাতখানি ওই বাড়িয়ে ধরো দাও গো আমার হাতে . . .)
আমি অশ্রুহীন, শান্ত, তাঁর শিরাওঠা হাত তুলে নিয়ে হৃদয়ে চেপেছি . . . ।

(৩)

(দীপ নিবে গেছে মম নিশীথসমীরে
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেও নাকো ফিরে . . .)

আর এখন, রবিবাবু, আমি আজো আপনাকে পাই
ফিউশনে আইপডে ডিস্কে চটুল . . .

শুধু ওই প্রেম ভেঙে ভেঙে গিয়েছিল যখন আমার
বারে বারে একটা ব্রেক আপ থেকে আর একটা ব্রেক আপে
আপনার গান দিয়ে ক্ষতগুলি মুড়িয়ে রেখেছি . . .

(আমি এলেম তারি দ্বারে, ডাক দিলেম অন্ধকারে . . .)
আমি আজো জানি রবি, কমিউনিকেশন হয়না, তবু, চেষ্টা করে যেতে হয়
মুহুর্মুহু কমিউনিকেশনের তরে . . .

যশোধরা রায়চৌধুরী – কবি, গল্পকার ও গদ্যকার। বহু পুরস্কারে সম্মানিত। দেশে বিদেশে বহু জায়গায় কবি হিসেবে আমন্ত্রিত। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ পদাধিকারীক।

স্নিগ্ধা সেন

কেন রক্তপাত

আমার ঘরের হেথায় হোথায়
বসে আছেন রবিঠাকুর
ফ্রেমে ধরা ফটো
বড় আর ছোটো
মূর্তি, মাটির কি ধাতুর ।

যেই আসে মাস বোশেখ, চব্বিশে
ঘোষিত ছুটি, বিশেষ পালন,
বেছে বেছে গান নাটক বাচন
নির্ভুল ভাবে রাবীন্দ্রিক-ই সে ।

মহড়া চলে অষ্টপ্রহর
প্রতিযোগিতায় কে কার ওপর !
এত ভীড়, এত হৈ হট্টগোল!
সুরলোকে কবি হ'ন বিহ্বল ।

দেখে ফাঁকি এই অতি-আচরণে
বলেন নিজের মনে ...
কতবার সঙ্গীতে
ছন্দে ছবিতে
বলেছি ফিরে ফিরে
জগৎ পারাবারের তীরে
মানব জাতির মিলনমেলা ।
কেটেছে জীবন বেলা ।

কবে কি বলেছি, লোকে ইচ্ছেমত
করে ব্যবহার ছেড়ে যুক্তিপথ
আসল কথাটা সবাই ভুলেছে
আজকে শিশুরা প্রশ্ন তুলেছে
এত রক্ত কেন ছড়িয়ে পথে?
পথ ভিজে গেছে কাদের রক্তে ?
কাদের মারছে? মারছে কারা ?

আমার সঞ্চিত রবিছবি যত
শব্দহীন হাহাকারে বলছে তারা,
"আমাকে যদি বেসেছ ভালো
অন্তরে যদি দিয়েছ ঠাঁই
রণহুঙ্কার কেন তবে তোলো ?
কেন কর এ লড়াই ?"

ইন্দিরা চন্দ

পথভোলা

কাছাকাছি পাশাপাশি
দুটি প্রাণ যে জোনাকি
জ্বলে, নেভে, ক্ষণে ক্ষণে
জেনে বুঝে বা অবুঝ মনে
মনের পথে শরীরযান
মেলছে ডানা গাইছে গান
"আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান..."

কোথায় সে কোন সাগর পারে
আলোর মালায় বা আঁধারে
দিকগুলো সব শূন্য যেথায়
রামধনু রঙ হাওয়ায় হাওয়ায়
চাঁদের চোখে চোখ মিলিয়ে
অজান্তে মন উঠছে গেয়ে
"দাঁড় ধরে আজ বস রে সবাই টান রে সবাই টান"

চলার পথে, পথের পাশে
বাঁশীর সুরটি হাওয়ায় ভাসে
মনে পড়ে সে কোন দিনে
সুর মিলিয়ে সুরের টানে
হাতে হাত মিল চোখের তারায়
গেয়েছিলো সে খোলা গলায়
"ঢেউয়ের 'পরে ধরবো পাড়ি – যায় যদি যাক প্রাণ"

আজ এখানে এ অবেলায়
সে গান বুঝি হাওয়ায় মেলায়
বুক বেঁধে আজ আশার টানে
নতুন ছন্দ নতুন গানে
একলা পথে একা চলা
সঙ্গী বিহীন কথা বলা
তবু,
"পালের রশি ধরব কশি চলবো গেয়ে গান..."

ইন্দিরা চন্দ – মেয়েবেলা কেটেছে মহারাষ্ট্র-র নাগপুরে। তারপর কোলকাতা। মনোবিদ্যা নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করতে করতেই বিয়ে। তারপর কর্মসূত্রে রাজস্থান, গুজরাট, মুম্বাইতে থেকে ২০০১ সাল থেকে দেশের বাইরে। ওমান এবং সংযুক্ত আমিরশাহীতে বেশ কিছু বছর কাটিয়ে ২০০৮ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার পার্থ-এ পাকাপাকি বাস। পেশায় হলেও নেশায় চিরকালই লেখালেখি। কবিতা, গান, নাটিকা, নাটক সব ক্ষেত্রেই নিজের প্রতিভার ছাপ রেখেছেন তিনি। পার্থ-এর বঙ্গরঙ্গ থিয়েটার গোষ্ঠী ওনার লেখা মঞ্চস্থ-ও করেছে। বহুদিন ধরে কলম ধরলেও তুলি ধরেছেন এই প্রথম। পুরোপুরি স্বশিক্ষিত শিল্পী। নাচ এবং গানে প্রশিক্ষণ থাকলেও আঁকা শেখেননি কোনোদিন। কিন্তু কবিতার বিষয়বস্তু এবং ছন্দের মতন ছবিগুলি রঙের ব্যবহার আর তুলির টান মন কাড়ে তার মননশীলতায়।

তপনজ্যোতি মিত্র

কবির ঘর

– জানো দাদু ওই পাহাড়ের ওপরে একটা কাঁচঘর আছে, সেইটা ছিল কবির ঘর।

– কি বলছো দাদু ? কবির ঘর ? কী আশ্চর্যের!

নাতি আর ঠাকুরদা দুজনেই দুজনকে দাদু বলে সম্বোধন করে। বড় গভীর তাদের ভালোবাসা।

এই দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের ওপরে সেই কবির ঘর! অমল বড় উতলা হয়ে উঠল। দেখতেই হবে।

– দাদু ঘরটা দেখে আসি।

বৃদ্ধ দাদু পরিচারক সুশীলকে ডাকেন।

– অমলকে পাহাড়ের ওপরে নিয়ে যাও সুশীল। দেখে এসো অমল। আমি তোমাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করি।

অমল ঠাকুরদাকে একটু আদর দিয়ে পাহাড়ে চড়তে থাকলো।

আজ তার কি আনন্দ। কত ছোটবেলা থেকে তার হাতে কবির বইগুলো ধরিয়ে দিয়েছে পিসি আর দাদু। কবির লেখা, তার বড় প্রিয়, বড় অন্তরের।

সূর্য অনেক আগে উঠে গেছে। তার সোনালী আভায় ঢেকে আছে মায়াবী পাহাড়।

পাহাড় থেকে নিচে নদী দেখা যায়, দেখা যায় উপত্যকা, জনপদ।

অমল যত ওপরে উঠছে, তত সে বিস্মিত হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে।

পাহাড়ের ওপর একটা সমতল জায়গায় সেই কাঁচঘর দেখা যাচ্ছিল। চারপাশে বাগান – তার মাঝখানে সেই কবির ঘর। অমল সেই দিকে এগোল।

কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল কবির লেখার টেবিল চেয়ার।

অমল শিহরিত হল।

এখানেই বসে কবি সৃষ্টি করেছিলেন অমূল্য সব সাহিত্য।

লেখার ফাঁকে কবি নিশ্চয়ই চোখ তুলে দেখতেন সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের অপরূপ সৌন্দর্য। হয়তো শুনতেন পাখিদের কলকাকলি।

বা কখনো এক নীরবতা এসে যখন ঢেকে দিত দিগন্তে ছড়িয়ে যাওয়া জ্যোৎস্নাকে – কবি সেই নীরবতার কাছে দাঁড়িয়ে এক মহাজাগতিক সত্তাকে অনুভব করতেন।

তখন তাঁর কলম কথা হয়ে উঠতো। মিলিয়ে দিত পূজা, প্রেম আর প্রকৃতির আবাহন।

অমল অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সেখানে।

যেন সেই বিস্মৃত অতীত তার সামনে বাঙ্ময় হয়ে উঠছে।

অনেকক্ষণ পরে তাকে ডাকলো সুশীল –

অমল চলো নিচে যাই, তোমার দাদু অপেক্ষা করছেন।

তারা নিচে আসার পর দাদু দেখলেন – অমল কেমন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে।

তিনি কিছু বললেন না।

মানুষ যখন কিছু গভীরভাবে উপলব্ধি করে তখন তাকে তার পরিসর দেওয়াই ভালো।

অমল বদলে যাচ্ছিল। কে যেন তাকে বলছিল – জেগে ওঠো অমল। তোমার জন্যই তো জেগে আছে অনন্ত, মহাপৃথিবী, দিগন্তের আকাশ।

একটা পাহাড়, একটা কাঁচঘর, আর এক মহাকবি তার জগতকে বদলে দিচ্ছিলেন।

অমলেরা যে কখন বড় হয়ে যায় !

অমল আরো একবার পাহাড়ে ফিরে এসেছিল।

সঙ্গে সুধা।

তখন অমলের সঙ্গে সুধার প্রণয় পর্ব চলছে।

পাহাড়ে উঠে অমল সুধাকে কবির ঘরের কাছে নিয়ে গেল।

বলল – জানো সুধা, এই ঘর আমার জীবনকে বদলে দেয়। এই পাহাড়, এই দিগন্তজোড়া প্রকৃতি, এই কাঁচঘর আমাকে বদলে দেয়। আমি কবির লেখাগুলো আরও পড়তে থাকি। বুঝতে পারি আমাদের চেতনার জগৎ জুড়ে যে আলো আঁধারির আভাস, সুখ দুঃখের যে মহাপৃথিবী – কবি তাকে স্পর্শ করেছিলেন।

গীতাঞ্জলি হাতে অনেকক্ষণ তারা পাহাড়ে চুপ করে বসেছিল।

তারপর একসময় নিস্তব্ধতা ভেঙে সুধা গেয়েছিল – "মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছো – তোমায় করি গো নমস্কার"।

কবির পাহাড়ে তারা ছড়িয়ে দিয়ে এসেছিল প্রেম আর ভালোবাসার অনুপম হেম কণাগুলো।

তৃতীয়বারের জন্য পাহাড়ে ফিরল অমল। সুধা নেই।

রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে একদিন থেমে গেছে সুধা।

পাহাড়ে এসে অমল সেই জায়গাটায় এল যেখানে তারা দুজনে বসেছিল।

সে সেই পাথরটাকে স্পর্শ করল।

সুধার সত্তা কি এই পাথরে ছড়িয়ে আছে?

সুধা সারা জীবন তাকে স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে গেছে।

এখন সুধাহীন এই করুণতম জীবন।

দূর আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল।

দিগন্ত বিস্তৃত গোধূলির এক মহা উদ্ভাসিত আকাশ।

একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। নামবে বৃষ্টি। নামবে কান্না।

কবির ঘরের কাঁচে জমে থাকবে বৃষ্টিকণা।

জীবন তো শুধু পদ্মপাতায় জল।

তবু ভালোবাসা থাকবে। মাধবী ভালবাসা।

আর কবি থাকবেন মরমে।

পাহাড় থেকে নেমে আসতে আসতে অমল কবির ঘরের দিকে তাকাল –

জীবন যেখানে মহাকাশকে ছুঁয়ে আছে।

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। বিভিন্ন প্রকাশিত গল্প কবিতা 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি', 'অমৃতের সন্তানসন্ততি', 'ঈশ্বরকে স্পর্শ', 'মায়াবী পৃথিবীর কবিতা', 'সুধাসাগর তীরে', 'সে মহাপৃথিবী', 'আকাশকুসুমের পৃথিবী' । কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্পও করতে ভালবাসেন।

রক্তকরবী প্রসঙ্গে – "রক্তকরবী" শতবর্ষে –

কৃতজ্ঞতা – উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠী, শিকাগো

স্বর্ভানু সান্যাল

আজ চারিদিকে যান্ত্রিকতা। চারিদিকে অস্থিরতা। চারিদিকে হিংসা ও হানাহানি। বস্তুসুখ লাভের মোহে ক্রমাগত ছুটে চলেছে মানুষ। তারা বুঝতে অক্ষম যে, যে সুখের সন্ধানে তারা ছুটছে, সেই সন্ধানই তাদের দুঃখের একমাত্র কারণ। গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবির একটি গান মনে পড়ে যায়।

এক যে ছিল রাজা তার ভারী দুখ... ভারী দুখ...
দুঃখ কিসে হয় ?
যার ভাণ্ডারে রাশি রাশি সোনাদানা ঠাসাঠাসি তারও হয়। জেনো সেও সুখী নয়...
যারে তারে দিয়ে শাস্তি রাজা কখনো সোয়াস্তি পাবে কি ?
দুখ কিসে যায় ? প্রাসাদেতে বন্দী থাকা বড় দায়।
একবার ত্যাজিয়ে সোনার গদি রাজা মাঠে নেমে যদি হাওয়া খায় ?
তবে রাজা শান্তি পায়।

রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী তাই যেন ভবিষ্যতের আয়না। যেন আজ আরও বেশি করে তাৎপর্যপূর্ণ। কোথায় আজ নন্দিনী যে কিনা আনন্দের বার্তা বয়ে আনবে আমাদের এই গ্রহণ লাগা যক্ষপুরীতে ? কোথায় আজ রঞ্জন যে কিনা হৃদয় আমাদের রাঙিয়ে দিয়ে যাবে ? কালজয়ী সৃষ্টি রক্তকরবী ও তার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমি ছন্দে রাখলাম আমার ছোট্ট পুজোর ডালি।

সত্যরে লও সহজে, তারে জানাও নিমন্ত্রণ
তোমার তুলি আঁকছে বিভোর নন্দিনী রঞ্জন
তোমার কথায় ফাগুন আসে, কথায় বাদল ঝরে
তোমার কথা লিখতে গেলে বসন্ত কম পড়ে
পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে পৌষ দিল ডাক
তোমার কলম অক্ষয় হোক, পঁচিশে বৈশাখ
বিশু পাগল গাইছে; তার ঘুম ভাঙানোর পণ
ভাঙবে বুঝি ভাঙবে আজ এ অচলায়তন
আলোর দিনের আঁকছে ছবি প্রাণের কবি রবি
নবীন কিশোর তোমায় দিলাম রক্তকরবী
রক্তনদী ডাক দিয়েছে নাইতে যাবি কে ?
রাজার মুখোশ খুলতে হবে আজকে কবিকে ...
প্রাণের খেলায় মাতবি আজি মাতবি সে কোন জন ?

স্বর্ভানু সান্যাল – জন্ম হাওড়ার রামরাজাতলায়। ছাত্রজীবন কেটেছে পুরুলিয়া, হাওড়া ও দুর্গাপুরে। কর্মজীবনে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। চাকরিসূত্রে বিভিন্ন দেশ ঘুরে শেষ নয় বছর আমেরিকার শিকাগোয় কর্মরত। পেশাদারি এবং পারিবারিক জীবন বাদ দিলে, তার অনেকটা সময় কাটে সাহিত্যচর্চা করে। অনুগল্প, রম্যরচনা, কবিতা, স্মৃতিকথা নিয়মিত লিখে থাকেন। ''যযাতির ঝুলি'' (https://jojatirjhuli.net) নামে তার ব্যক্তিগত ব্লগ আছে এবং সেই ব্লগ এর মাধ্যমে তার লেখা নিয়মিত পাঠকদের সাথে ভাগ করে নেন। ব্লগটি বেশ জনপ্রিয় এবং সেটির সাথে লিঙ্কড একটি ফেসবুক পেজও আছে (https://www.facebook.com/jojatirjhuli)। প্রতিটা লেখকের মধ্যেই বাস করে তার লেখার এক চরম ও নির্দয় বিচারক। স্বর্ভানুর বিচারে সে সাহিত্য সাগরের ধারে বসে শুধুমাত্র নুড়িই কুড়িয়েছে। অন্য শখের মধ্যে আছে বেড়ানো, ফটোগ্রাফি, গান শোনা। আর অবশ্যই কারণে অকারণে একটু গড়িয়ে নেওয়া।

দেবীপ্রিয়া রায়

আমার চোখে রক্তকরবী

রাজা, রঞ্জন আর নন্দিনীর সাথে প্রথম কবে কখন পরিচয় হলো, ঠিক মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের সাথে তো সেই সহজ পাঠ, শিশু আর শিশু ভোলানাথ পড়তে গিয়ে আলাপ। তারপর গল্পগুচ্ছ, সঞ্চয়িতা, আর ডাকঘর, মুকুট এমনি কত লেখা তাঁর পড়লাম – জীবনের ধাপে ধাপে তাঁকে আশ্রয় করেই তো আমার মনের জগৎ গড়ে উঠেছে – তাঁর গান এনে দিয়েছে কৈশোর হৃদয়ে প্রেমের প্রতিধ্বনি, ক্রমে সে গানে জেগেছে ঈশ্বর চেতনা – কিন্তু রক্তকরবী শুধুই জাগিয়েছে না বোঝা কেমন এক মুগ্ধতা। মনে হয়েছে যেন সবটুকুই বুঝি কিন্তু কিছুই বুঝছিনা। ৬০-এর দশকে যখন কৈশোরের শেষ ধাপে পা রেখেছি, তখন সৌভাগ্যবশত দেখতে পেয়েছিলাম শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের মঞ্চাভিনয় – তাতে মুগ্ধতা বেড়েছে, কিন্তু বোঝার ভাগ যে বিশেষ বেড়ে উঠেছে, তা মনে হয়না। সেই বয়সে না দেখা রঞ্জনের প্রতি নন্দিনীর উত্তাল প্রেমই মনে ঢেউ তুলেছে বেশী।

কিন্তু তারপরে জীবনের পথে যেমন যেমন এগিয়েছি, তেমনি চার পাশের ঘটনাপ্রবাহ দেখে বারে বারে মনে পড়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীকে। মনে হয়েছে তাঁর ঋষিতুল্য দৃষ্টিতে তিনি সমকালীন ইতিহাসের মাঝে আগামীর ছায়া প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। প্রথম কবে সে কথা মনে হলো, সেটা বলি। ততদিনে এই ধনতান্ত্রিক দেশ আমেরিকার বাসিন্দা আমি। সময়টা মনে হয় ৯০এর দশকের শেষাশেষি। এদেশের সমৃদ্ধি তখন সকলের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে। পাড়ার লাইব্রেরী থেকে দক্ষিণ আমেরিকার এক লেখকের একটি বই সংগ্রহ করে পড়তে বসেছি – লেখকের নাম আর বইয়ের নাম, কিছুই আজ মনে পড়ে না – শুধু উজ্জ্বল হলুদ কাঁচা সোনা রঙের মলাটটির কথা মনে আছে। কাহিনীও সেই স্বর্ণ খাদানের – স্পেনদেশীয় আক্রমণকারীরা যখন মেক্সিকো দখল করল, তারা সেখানকার বাসিন্দাদের লোহার শেকলে বেঁধে চাবুক মেরে সেখানকার খনি হতে সোনা তুলে আনার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। খনির অন্ধকার গহ্বরে ওঠা নামার কোন সুব্যবস্থা নেই, হতভাগ্য শ্রমিকেরা বিনা পারিশ্রমিকে চাবুকের ঘা খেতে খেতে তাল তাল সোনা তুলে আনে রাত দিন, আর মাঝে মাঝেই পা ফস্কে পড়ে খনির গভীরে তলিয়ে যায়। তাদের আর্তনাদ সেই গহ্বরে ঘুরে মরে; কেউ তাতে কর্ণপাত করেনা – সোনা তুলে আনার কাজ নির্বাধে চলতে থাকে। পড়তে গিয়ে শিউরে উঠেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ কি রক্তকরবীতে এই কাহিনীই লিখে গিয়েছেন !

এরপরে আমার চারপাশে আরও সময় বয়ে গিয়েছে – কাল উল্টে গিয়েছে ইতিহাসের পাতা। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি আমরা ক্রমেই হয়ে পড়েছি এক যক্ষপুরীর নাগরিক – আমাদের চালনা করছে এক মকর রাজ – তাকে আমরা কিছুটা বুঝি, অনেকটাই বুঝিনা, তবে প্রশ্নহীন আনুগত্যে তার আজ্ঞা পালন করি। প্রশ্ন যে জাগে না তা নয়, কিন্তু সে প্রশ্ন বুদ্‌বুদের মতই মিলিয়ে যায়। তার অধীনস্থ প্রজা হয়ে সমৃদ্ধির চূড়ায় উঠছিলাম সেদিন শুধু এদেশে আমরাই নয়; সে সমৃদ্ধির অংশভাগী হয়ে উঠছিল সকলেই যারা আজকের যুগের সভ্যতার অংশীদার। কিন্তু সমৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে মনে মনে বুঝতে পারছিলাম যে আমরা সকলেই যেন ক্রমশঃ এক অসহায় দারিদ্র্যের মাঝে তলিয়ে যাচ্ছি। সে দারিদ্র্য মানসিক দারিদ্র্য – আমাদের ঘরের কোণে জমে উঠছে টাকা পয়সার স্তূপ, তা দিয়ে আমরা জোগাড় করে আনছি নিত্য নতুন অভাবনীয় বিলাস ব্যসন সামগ্রী। কিন্তু সে সব ভোগ করার মত আমাদের নেই অবসর – দিন রাতের বেশীর ভাগ সময়টায় আরো সম্পদ আহরণে আমরা ছুটছি নিয়ত না দেখা এক মকর রাজের আদেশে। আমাদের সে সম্পদের সিংহ ভাগ দিয়ে ভরে উঠছে সেই মকর রাজ্যের তোষাখানা। সে রাজাকে আমরা ধরতে ছুঁতে পারিনা, কঠোর নিষেধ, নিয়ম কানুন আর কিছুটা রহস্যের এক জালের আড়ালে তার সম্পূর্ণ চেহারাটা আমাদের চোখে ধরা পড়ছে না, কিন্তু তাকে ভয়ে ভক্তিতে মান্য করে চলি। তার আদেশ, নির্দেশে আমরা সোনা ও ধন-দৌলত জমিয়ে তুলি, জোগাড় করে আনি ওই

বিলাস ব্যসনের সামগ্রী আর সরঞ্জাম। সে সরঞ্জাম যত জমছে, তত আমাদের চারিপাশে গড়ে উঠছে একটি একটি করে অদৃশ্য এক কারাগারের দেওয়াল। সে দেওয়াল ভেঙে ফেলার সাধ্য আমাদের আর নেই। আমরা যাতে কখনো সে দেওয়ালের বাইরে পা না বাড়াই, তাই আমাদের উপরে রাজা মশায়ের মন্ত্রী, সান্ত্রী সেক্রেটারি, ডিপার্টমেন্ট-কত না নামে বসেছে রক্ত চক্ষু কড়া পাহারা। খোলা বাতাসে পা না ফেলে ফেলে আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসছে আমাদের মুক্ত হাসি আর আনন্দের ছন্দ, ভোঁতা হয়ে উঠছে আমাদের ভাল মন্দ বিচার বোধ। আমাদের হাতে পায়ে শিকল নেই বটে – আমরা ছুটছি, খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি নিজের হাত পা নেড়ে, কিন্তু শিকল পরেছে আমাদের মন। আমরা সবাই যেন এক ছাঁচে ঢালাই হয়ে যাচ্ছি, তাই নিজেদের নাম পরিচয় ব্যক্তিত্ব হারিয়ে শুধু হয়ে উঠেছে মকর রাজ্যের স্বর্ণ সংগ্রহের যন্ত্রাংশ। আমাদের পরিচয় তাই বদলে গিয়েছে। কারুর মনে নেই কি তার নাম, কোথায় তার সাকিন। আমাদের পরিচয় এখন শুধুই যেন একটি সংখ্যা – ৪৭ এর খ বা ২৫ এর ঙ। তবু যদি হঠাৎ কখনো নিজের মত করে ভাল মন্দ ভেবে বসি, হেসে উঠি খোলা মনে, তাই আমাদের উপর চোখ রেখেছে মোড়ল আবার তাদের ওপর কড়া পাহারায় রয়েছে সর্দারের দল, যাদের গৃহিণীরা আমাদের তাচ্ছিল্য করে। তারা ভাবে তারা রাজার কাছের লোক, তাই তারা ধুমধাম করে রাজার হয়ে স্বর্গ মর্ত্য পাতালের অধীশ্বর দেবতার ধ্বজা পূজা করে। তারা কেউই অবশ্য বুঝতেও পারে না যে আসলে তাদের আর আমাদের মাঝে কোন তফাৎ নেই – তারাও মকর রাজের ইচ্ছার অধীন। তারাও খনি হতে সোনা তোলার যন্ত্রেরই একটি অঙ্গ। কেউ কারুকে বিশ্বাস করি না তাই আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে চরের জাল। যদি অন্য চিন্তা মাথায় আসে, কারাগারের বাইরে মুক্তি খোঁজার ইচ্ছা হয়, সেই জন্য গোসাঁই-এর মত নানান ধর্মগুরু দিয়ে আমাদের চোখে শক্ত করে এঁটে দেওয়া হয়েছে ধর্মের ঠুলি। তাদের দেব মন্দির প্রাঙ্গণের লাগোয়াই রয়েছে অস্ত্রশালা আর মদের ভাঁড়ার। ধর্ম নিয়ে মেতে উঠে রঙ্গীন নেশায় মাতোয়ারা হয়ে আমাদের চিন্তাশক্তি ঘুমিয়ে থাকে, জেগে থাকে শুধু অস্ত্র আস্ফালন করে বাহুবল দেখানোর বা রক্ত ঝরানোর ঝোঁক। তবু যদি যুক্তি জাগে, তার জন্য আরো আছেন অধ্যাপক যিনি পুঁথি পাটা ঘেঁটে আমাদের যুক্তি উদ্ভাবন করে বোঝান যে যা ঘটছে, সবই ন্যায়সিদ্ধ, স্বাভাবিক ঘটনা।

পড়তে পড়তে মনে হয় যে এ যেন সত্যি আমাদের আজকের সমকালীন প্রবহমান জগৎ। শুধু বুঝতে পারি না যে আমাদের এই যক্ষপুরীতে নন্দিনী কখনো আসবে কিনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আঁকা যক্ষপুরীতে এনেছেন নন্দিনীকে। কে সে? সে নাচের ছন্দে সহজ তালে ছুটে চলা এমনি এক মেয়ে, যাকে অধ্যাপক বলে অন্ধকার কারাগারের পাকা দেওয়ালের ফাটল দিয়ে এসে পড়া এক ঝলক আলো। রাজাকে সে ভয় পায়না – বরং আড়ালটুকুর ওপারে আসল রাজার স্বরূপ জানার অগাধ কৌতূহলে সে বারেবারে রাজার কাছে যায়, হাজার ভয় দেখানোতেও সে পিছু হটে না, – যক্ষপুরীর শ্বাস বন্ধ করা বোবা অন্ধকারে সে সজীবতার আগন্তুক। কিশোর তার নির্মল মন দিয়ে তাকে খানিক বোঝে, তাই সে নন্দিনীকে ভালবাসে; অধ্যাপক তাঁর পুঁথির থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে তাকে দেখে যুক্তি ভুলে তার হাতের রক্ত করবী কঙ্কনের ফুল চেয়ে নেন, রাজার চর বিশু পাগলকে নিজের সহজ হাসির জাদুতে চর বৃত্তি ভুলিয়ে নিজের মত বিদ্রোহী করে তোলে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য যে রাজাও তাকে দখল করতে চায়, আপনার করে পেতে চায়, কারণ সেও মাটির তলায় মৃত্যুপুরীতে ঘুরে ঘুরে মরা পশুর হাড় অর্থাৎ খনিজ পদার্থ – তা সে তেল বা কয়লা বা মহার্ঘ ধাতু তুলে তুলে ক্লান্ত। তাই নন্দিনীর মাঝে জীবনের যে উষ্ণতা তাকে সে নিজের করে পেতে চায়।

নাটকটি যখনই পড়ি, আমার এই জায়গায় এসে বারেবারে মনে হয় যে এই যক্ষপুরীর রাজা যেন গ্রীক পুরানের হেডিস। পাতাল লোকে সে রাজা, অন্ধকারে বাস তার। সে আঁধার রাজত্বে অজস্র সম্পদের মাঝে বড় নিরানন্দে বাস করে, আর তাই উষ্ণ জীবনের লোভে সে আলোকোজ্জ্বল প্রান্তরের বুক হতে হরণ করে নিয়ে যায় নিষ্পাপ কুমারী পার্সিফোনিকে। যক্ষপুরীর অন্ধকারে সে কন্যা নির্জীব মৃতপ্রায় হয়ে থাকে, সেই সাথে পৃথিবী হারিয়ে ফেলে তার শ্যামলিমা। যখন সে কিছুদিনের জন্য পৃথিবীতে ফেরে, বসন্তের রঙে সেজে ওঠে প্রকৃতি। নন্দিনীও তেমনি মাটির উপরের সবুজটুকু জাগিয়ে তোলে, সে জীবনের প্রতীক। রাজার উচ্চাকাঙ্খাকে সে যেন বিদ্রুপ করে, তাই রাজা তাকে চটকে পিষে তার রং টুকু নিজের মাঝে মিশিয়ে নিতে চান। কিন্তু নন্দিনী কারুকে ধরা দেয় না। সে থাকে রঞ্জনের

অপেক্ষায়। এই নাম দুটি পরম অর্থবহ। নাটকের খসড়া দেখলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ বারে বারে নন্দিনী চরিত্রটির নাম পাল্টেছেন। কখনো বলেছেন খঞ্জনা, খঞ্জন, কখনো নন্দিন, এবং শেষে বলেছেন নন্দিনী। নন্দিনী মানে যে নন্দন করে – আনন্দ দেয় – এ মেয়ে জীবনের আনন্দের প্রতীক। যাকে এ মেয়ে ভালবাসে সে হল রঞ্জন – সে রাঙিয়ে দিয়ে যায় নন্দিনীর চারিপাশ – নন্দিনীর রঞ্জন তাই সে। তারা দুজনে জীবনের আনন্দকে রঙে ভরিয়ে দিয়ে যায়। নন্দিনী তাকে বলে আকাশের গায়ে মেলে দেওয়া পাল আর নিজেকে বলে জলের মাঝে ভেসে চলা হাল। নন্দিনীর কাছে কেউ ফুল চাইলে সে যে চায় সকলকেই দেয় পবিত্রতার প্রতীক শুভ্র কুন্দ ফুল। আনন্দের কাছে তাই তো প্রাণের পাওনা। কিন্তু নিজের রঞ্জনের জন্য নন্দিনী সাজে তার ভালবাসার রঙে রাঙানো রক্ত করবীর মালায়। সে রক্ত করবী ফুল ফোটে ধনীর সাজানো বাগানে নয়, সে ফুটে ওঠে জঞ্জালের স্তুপের মাঝে একটি রিক্ত শাখায় – সকল মালিন্যের ঊর্দ্ধে সেটি ভালবাসার, জীবনের জয়ধ্বজা। কাহিনীর শেষে ভেঙে পড়ে কারাগার। ভাঙনের মাঝে ভালবাসার জোয়ারে স্বয়ং রাজা ভেসে যান – তিনি নিজেও নন্দিনীর হাত ধরে ভাঙনে ছুটে চলা জনতার মাঝে যোগ দেন – শুধু রঞ্জন আর নন্দিনী সেই জনসমুদ্রে হারিয়ে বা হয়তো পিষে যায়। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেন নি যে কি হল তাদের পরিণতি। নাটকের শেষে জেগে থাকে শুধু তাদের রক্তরেখা – তাদের ভালবাসার স্বাক্ষর।

হঠাৎ পড়লে কিংবা শুনলে মনে হয় যে এ নাটক বুঝি সাম্যবাদের প্রচার করছে। রবীন্দ্রনাথ যেন এর মাঝে শ্রেণীসংগ্রামের বিবরণ তুলে ধরেছেন। শুনেছি যে স্বাধীনতা পরবর্তী ৫০ এর দশকে যখন বিপ্লবী বামপন্থার ঢেউ এসেছিল, তখন এ নাটকটিকে সে ভাবেই দেখা হতো। রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু এটিকে রূপক বলে ভাবতে বা বিশ্লেষণ করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন এ কাহিনী চিরকালীন – তাঁর অভিমত যে এটি কৃষি সভ্যতা ও যন্ত্র সভ্যতার দ্বন্দ্বের ইতিহাস। তাঁর মনে হয়েছিল বাল্মিকী তাঁর রামায়ণে নবদুর্বাদল শ্যামলরূপ রামের মাধ্যমে এই কাহিনীই বলে গিয়েছেন। রামের স্ত্রী সীতা সোনার হরিণের মায়ায় ভুলে যন্ত্র সভ্যতার অধিনায়ক সুবর্ণ লঙ্কার অধিপতি পরম শক্তিধর রাবণের হাতে বন্দিনী হয়েছিলেন। তাঁকে সেই যন্ত্র সভ্যতার কারাগার হতে মুক্তি দেয় শেষে বনবাসী রাম আর অরণ্যচারী বাঁদরেরা। শ্যামল সবুজ কৃষি ও অরণ্য সভ্যতার কাছে যন্ত্রসভ্যতা হার মানতে বাধ্য হয়।

রবীন্দ্রনাথ নিজে এক নাট্যকার হলেও কখনো এ নাটকটিকে মঞ্চস্থ করান নি, কারণ তিনি নাকি নন্দিনী চরিত্রাভিনয়ের মত কোন মেয়েকে খুঁজে পাননি। প্রথম এ কাজে হাত দিয়েছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এটিকে মঞ্চে অভিনয় করা হ'লে ও এটি দর্শকের মনে দাগ কাটেনি। হয়তো তাঁরা এটিকে বোঝেন নি। স্বয়ং উৎপল দত্ত মশাই নাকি এটিকে "অনভিনেয়" সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল এর চরিত্রগুলি সত্যিকার মানব চরিত্র নয়, শুধুমাত্র কিছু আইডিয়ার মূর্ত রূপ। একমাত্র শম্ভু ও তৃপ্তি মিত্র দম্পতি বোধহয় এর ভিতরের সুরটি ধরতে পেরেছিলেন – তাই তাঁদের অভিনয় আজও দর্শকের মনে অম্লান হয়ে রয়েছে।

আজ চারিদিক দেখে আবার মনে হয় যে অনাগতকে প্রত্যক্ষ করে যেন রবীন্দ্রনাথ এ নাটক লিখেছিলেন। বস্তুবাদী যন্ত্র সভ্যতা আজ তার ধনতান্ত্রিক লোভ, তার নখে দাঁতে আমাদের ঘিরে ধরেছে, ভয়, সন্দেহ, লোভ আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তখন কেবলই মনে হচ্ছে কোথায় আছে নন্দিনী? সে আর তার রঞ্জন আজ একটি বার আমাদের কারাগারের বিষবাষ্প ভরা অন্ধকার হতে মুক্তির পথে নিয়ে যাক।

দেবীপ্রিয়া রায় – লিখছেন স্কুল ও কলেজের দিন থেকে। পেশায় দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপিকা ও গৃহিণী। কাশীর প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মেয়ে দেবীপ্রিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে ডক্টরেট করে বিবাহসূত্রে সেই বছরেই আমেরিকা এসে শিকাগো শহরে বাসা বাঁধেন। গত ৪০ বছর শিকাগোর বাঙালী ও অবাঙালী সমাজের সাথে নানা ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। সাহিত্য চর্চা দেবীপ্রিয়ার নেশা। শিকাগোর উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম সদস্য।

Indrani Mondal

Rakto Karobi – A Persistent, Modern Dilemma – Thoughts then and Now

Rakto Karabi is one of the most discussed and most analyzed plays written by Bengal Poet Laureate Rabindranathe Tagore, in the early twentieth century. It is interesting to note that over the years this play has been adopted and presented with experimental variations and different styles by several renowned theater groups mostly from Bengal, even though poet himself had cautioned against interpreting this piece as a stylized allegory . The play was translated in English, also in the early twentieth century, by the Poet Laureate himself, with the title Red Oleanders. The English version of the play got a lukewarm reception as it was considered too symbolic for a stage performance by Western critics.

When I read Rakto Karobi as a student and tried to understand its significance, here's what my thoughts were. Rakto Karobi seemed metaphoric and non-substantial to me on first read. Soon I realized it was mostly about a war of worlds - the colossal strength of the world of industrialization, very evident in the early twentieth century, against the much neglected because subtle and outdated, strength of the world of agriculture. Though this war of worlds was the backdrop of the play and at the center of it, I couldn't find much action packed depictions of the war itself except in snippets and suggestions. It just had this basic theme of the tension of these two ideologies of blatant materialism and mindfulness, which though drawn to each other, can never meet and reconcile due to their inherent differences. This straightforward war of worlds was made complex by portraying it through a war of words in a love hate relationship dynamic. For me the tide of evocative language and wordy dialogue hampered the pace of the play's performance. I missed the actual incidents of conflict and drama that usually characterizes staged plays.

As my understanding and appreciation of Tagorian literature matured, I soon realized that Rakto Karobi was penned by a playwright who was also a versatile romantic poet and a profound philosopher. Thus his love of language and word nuances would be apparent in his play, needless to say. Also humans were fast losing touch with Nature and the craze for materialistic possessions was often at the cost of ignoring Nature's healing powers and its crucial role in the wholistic wellbeing of society. The poet had environmental issues on his mind and was trying to interest his audience in that cause. The characters that had seemed disembodied to me when I first read the play, soon took on new depth and dimension.

Ranjan though never seen in the play, became a tangible emblem of the always loved and adored simple, pure life, untainted by greed of material might. Nandini stood for the sensitive and discerning mind that could figure out the value that Ranjan personified. She needed to symbolize that precious awareness through the tender natural wealth and abundant color of red oleander or Rakto karobi flowers, the poet's direct reference to treasures in Nature. The passion with which Nandini awaits and pursues Ranjan takes this conflict of perspectives as the background of the play, to the level of a love story. The love story in turn spills over to a much wider plane of finding the true meaning of what happiness is for each of us in our lives.

The poet playwright's emphasis remains all along that true and quintessential joy lies in acknowledging the role of simplicity, humility and naturalism in our human existence, away from momentary satisfactions that physical grandeur brings. Tragedy strikes when the valuable, ever sought after ideal is slaughtered by conniving materialists and Ranjan is assassinated by double crossing, power hungry materialist middlemen and war lords.

Raja, personifies material might, which gives him ultimate strength to control. He is always depicted as behind a screen or a barrier to symbolize his distance from regular petty workers of the soil and poor laborers whose hard work and rigorous toil make him rich and give him the power to rule. In this way, I soon realized that in this multilayered play of tensions and tug of war of power, the word wars filled with intense rapid fire

conversations loaded with double meaning, were really very interesting and often gripping. Even though the poet himself had forbidden reading between the lines of this play and finding loaded underlying meaning, it was easy to see Rakto Karobi is a play with a purpose and a definite message. The interplay of different philosophies in the play are there because there were also raising crucial questions in the poet philosopher's sensitive, thoughtful mind.

In the past Rakto Karobi 's focus to me was the love story of Nandini and Ranjan who passionately tried to find and hold on to each other knowing full well that worldly forces would always keep them apart.

But later on and specially now, the character of Raja seems most realistic and true to the times. This role of the king who sits atop all the material wealth his underlings acquire for him is the most tormented persona of all in the play. He can never be satisfied with what he is and has, as he is constantly questioned by the earnest Nandini who dares to defy his strength and openly adores what Ranjan stands for. Her ardent hope and conviction that the pure and the good will eventually triumph, fascinates him and eventually raises doubts in his mind about the veracity of his wealth and sovereignty. His ego is hit hard when he finds that his own henchmen, fearing his weakening towards Nandini's philosophy, symbolized poetically by her lovely Rakto karobi, have fooled him into killing Ranjan, the very symbol of his antithesis and Nandini's ideal. It makes him question his position of ultimate power that he had hitherto believed in. Unable to bear the guilt and truly swayed by what the naturalists believe in, he joins Nandini and her followers ready to fight materialism and find a new all inclusive way of life where man and nature can live in harmony and there is no greed.

This conclusion clearly hints at Tagore's faith in naturalism showing the way to temper materialist surfeit with purity and simplicity a very modern wholistic approach to life and living. So it is not hard to see that Rakto Karobi is more than a play, it is a declaration of Tagorian philosophy which had its firm roots in the ancient Upanishadic values of simple living and high thinking, which could temper the terrors and power games that too much materialistic wealth and forceful control bring.

Indeed it was this model on which Tagore later built his brainchild and his greatest legacy Vishwa Bharati University, in Shantiniketan. The mission of this school is to provide education and vocational training that reflect a harmonious blend of traditional values and modern science in contemporary learning, encompassing global participation and universal accord.

Indrani Mondal studied in Calcutta and Jadavpur Universities, India, and holds a PhD in Philosophy and Social Studies. A freelance writer in both English and Bengali, over the last decade Indrani has written fiction, nonfiction and poetry, mainly on social and cultural issues facing immigrants and has published three books of poetry “Fugitive Wings”, “Pratidin Sati Hoi” and “Raater Sarir”. She is an active member of the Chicago Creative Circle.

সঞ্জয় ব্যানার্জ্জী

হে মহাজীবন, হে মহামরণ

“...

১৯৪১ (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)-এর ২২শে শ্রাবণ (৭ই আগস্ট)।

শুকনো মুখ, উশকো চুল, চাপা ঠোঁট আর না-কামানো গাল – এতদিনের মধ্যে কখনো স্বাতী দেখেনি সত্যেন রায়ের এ-রকম চেহারা। আর কথা যখন বললেন, আওয়াজটাও অন্যরকম শোনাল :

“শোনোনি এখনো ?”

“কী ?”

সত্যেন চোখ তুলল স্বাতীর মুখে, চোখ নামালো মেঝেতে, বললো, ‘রবীন্দ্রনাথ’ – আর বলতে পারলো না।

সঙ্গে সঙ্গে স্বাতীর মাথা নিচু হ’ল, আর হাত দুটি এক হ’ল বুকের কাছে।

দু-জনে দাঁড়িয়ে থাকলো মুখোমুখি। কিন্তু মুখোমুখি না, কেননা দু-জনেরই নিচু মাথা, আর দুজনেই চুপ। একটু পরে সত্যেন চোখ তুললো; স্বাতী তা দেখলো না, কিন্তু সেও চোখ তুললো তখনই : প্রশ্নহীন শান্ততায় তাদের চোখাচোখি হ’ল।

সত্যেন রায়ের দাড়ি-গজানো শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে স্বাতী বললো, “কিন্তু আপনার স্নান-খাওয়া বোধহয় –”

“ও-সব এখন না”, ঈষৎ ভঙ্গি হ’ল সত্যেনের কাঁধে, ঈষৎ অসহিষ্ণুতার । “আর দেরি না। চলো !”

“আপনি একটু কিছু খেয়ে নিন। কিচ্ছু খাননি সকাল থেকে ?”

“না, না!” একটু জোরেই ব’লে উঠলো সত্যেন। মনে-মনে একটু খারাপ লাগলো তার – যেন আঘাত লাগলো তার – আজকের দিনে, এ-রকম সময়ে এ-সব তুচ্ছ খাওয়া-টাওয়া নিয়ে স্বাতীর এই ব্যস্ততায়। সকালে প্রথম পেয়ালা চায়ের পরে এ-পর্যন্ত কিছুই খায়নি, তা সত্যি : কিন্তু এখন তার ক্ষুধাবোধ একটুও ছিলো না, ক্লান্তিও না; আর কোনো চেতনাই তার ছিলো না দুঃখের চেতনা ছাড়া; মহৎ, মহামূল্য, তুলনাহীন দুঃখ; কল্পনায় চেনা, সম্ভাবনায় পুরোনো, তবু বাস্তবে আশ্চর্য, আকস্মিকের মতো নতুন, অবিশ্বাস্যের মতো অসহ্য। সকালে গিয়ে যেই বুঝলো যে আজই শেষ, তখনই স্থির করলো শেষ পর্যন্ত থাকবে – তারপর কেমন ক’রে কাটলো ঘন্টার পর ঘন্টা, ভিড় বাড়লো, জোড়াসাঁকোর বড়ো-বড়ো ঘর আর বারান্দা ভ’রে গেল, উঠোনে আরো–; টেলিফোনে ব’সে গেঞ্জিগায়ে কে-একজন ঘামতে-ঘামতে খবর জানাচ্ছে চেঁচিয়ে ; তাছাড়া চুপ, অত লোকের মধ্যে কারো মুখেই কথা নেই, চেনাশোনারা পরস্পরকে দেখতে পেয়ে কিছু বলছে না, নতুন যারা আসছে তারা কিছু জিগেস না-ক’রেই বুঝে নিচ্ছে। অপেক্ষা, বোবা অপেক্ষা, শুধু অপেক্ষা – কিসের ? একবার, অনেকক্ষণ পর, একটু বসেছিলো সে, ব’সে থাকতে-থাকতে হঠাৎ একটা শব্দ শুনলো – পাশের ঘর থেকে - অনেকক্ষণ চেপে রাখার পর বুকফাটা ঝাপ্টা দিয়েই থেমে যাবার মতো, আর সঙ্গে-সঙ্গে অনেকেই তাকালো হাতের, দেয়ালের ঘড়ির দিকে, বারোটা বেজে কত মিনিট কী – যেন ফিশফাশানি উঠলো । খানিক পরে যখন একবার ক’রে যাবার অনুমতি দিলো সবাইকে – সেও গেলো। মাথাটি মনে হ’ল আগের চেয়েও বড়ো, প্রকান্ড, কিন্তু শরীরটি একটু-যেন ছোটো হ’য়ে গেছে, যদিও তেমনি চওড়া কব্জির হাড়, তেমনি প্রচন্ড জোরালো আঙ্গুল। শেষবার সে চোখ রাখলো তার কতকালের চেনা সেই মুখের, মাথার, কপালের দিকে, মহিমার দিকে; একবার হাত রাখলো হিমঠান্ডা পায়ে ।...

আর সেই মুহূর্তটি যেই মনে পড়লো সত্যেনের, যেই দেখতে পেল মনের চোখে আবার সেই প্রকান্ড মাথার ক্লান্ত নুয়ে পড়া, অমনি তার বুক ঠেলে একটা গরম শিরশিরানি উঠলো, মুখ ফিরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি । মুহূর্তের চেষ্টায় আত্মস্থ হ'য়ে নিয়ে আবছা একটু হাসির ধরনে বললো, "আচ্ছা, জল দাও এক গ্লাশ ।"

ওপরের অংশটি বুদ্ধদেব বসুর তিথিডোর উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত, ১৯৪১ -এর ২২শে শ্রাবণ সত্যেন রায় আর স্বাতীর কথোপকথন। মহতী দুঃখ, অলৌকিক এক জীবনের মহাপ্রয়াণের দিনের পটভূমিতে উপরোক্ত আখ্যানের বর্ণনা। নশ্বর, মানবশরীরের মৃত্যুর অনিবার্যতাকে অতিক্রম করে অমৃত জীবনলোকের সত্যমূল্য প্রকাশ পাওয়া সেদিনের স্মৃতি আমাদের উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া এক পবিত্র সম্পদ। কবির জীবনের শেষ বছরের বিষাদলিপির বিবরণ আমরা পাই তাঁর কাছের কিছু মানুষজনের স্মৃতিচারণা থেকে। আজকের এই অপটু, হেলাফেলা রচনার প্রচেষ্টা সেইসব কিছু জানা, অজানা নানা ঘটনার স্মৃতিচারণের মাধ্যমে জ্যোতির্ময় পুরুষের উদ্দেশ্যে প্রণামের অঞ্জলি প্রদান ।

ছেলেবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী । তাঁর নিজের কথায় – " ... শরীর এত বিশ্রী রকমের ভালো ছিল যে, ইস্কুল পালাবার ঝোঁক যখন হয়রান করে দিত তখনও শরীরে কোনোরকম জুলুমের জোরেও ব্যামো ঘটাতে পারতুম না। জুতো জলে ভিজিয়ে বেড়ালুম সারাদিন, সর্দি হল না। কার্তিক মাসে খোলা ছাদে শুয়েছি, চুল জামা গেছে ভিজে, গলার মধ্যে একটু খুসখুসানি কাশিরও সাড়া পাওয়া যায় নি। আর পেট-কামড়ানি বলে ভিতরে ভিতরে বদহজমের যে একটা তাগিদ পাওয়া যায় সেটা বুঝতে পাই নি পেটে, কেবল দরকার মতো মুখে জানিয়েছি মায়ের কাছে। জ্বরে ভোগা কাকে বলে মনে পড়ে না। ম্যালেরিয়া বলে শব্দটা শোনাই ছিল না। ওয়াক-ধরানো ওষুধের রাজা ছিল ঐ তেলটা, কিন্তু মনে পড়ে না কুইনীন। গায়ে ফোঁড়াকাটা ছুরির আঁচড় পড়ে নি কোনোদিন। হাম বা জলবসন্ত কাকে বলে আজ পর্যন্ত জানি নে। শরীরটা ছিল একগুঁয়ে রকমের ভালো ।"

অনিন্দ্যসুন্দর রূপের অধিকারী, স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘদেহী (৬'২") রবীন্দ্রনাথের শরীরে বড়সড় রোগের প্রথম লক্ষণ, কিডনির সমস্যা (ইউরেমিয়া) শুরু হয় ১৯৩৭ সালে। ১৯৪০ থেকে তা গুরুতর রূপ ধারণ করে এবং জীবনের শেষ দু'বছর এই সমস্যায় প্রচন্ড কষ্ট ভোগ করেছিলেন কবি। ডাক্তারদের নিষেধ না মেনেই ১৯৪০-এর শরৎকালে কালিম্পং-এ যান কবি । তার আগে দীর্ঘ অসুস্থতায় কবির মনের জোর কিছুটা দমে গিয়েছিল ততদিনে। কবির স্নেহের বৌমা, প্রতিমা দেবীর স্মৃতিচারণে কবির কালিম্পং-এ এসে পৌঁছনোর সকালের দৃশ্য ধরা আছে এইভাবে, "... উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় শুনি হর্ন বাজাতে-বাজাতে প্রকাণ্ড মোটরটা পাহাড়ের সরু রাস্তা বেয়ে নেমে আসছে। গাড়ি এসে দরজায় দাঁড়ালো। আমরা এগিয়ে গেলুম, সুধাকান্ত[১] দেখলুম আগেই নেমে পড়েছে, তারপর বাবামশায়কে হাত ধ'রে নামিয়ে নিলে। এবার তাঁকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছিল। তাঁকে ঘরে নিয়ে আসা হলো, চৌকিতে বসলেন, আমরা সকলেই খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলুম। বাবামশায় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বললেন, *"বৌমা, মৈত্রেয়ী লিখেছিল ওর ওখানে যেতে কিন্তু সেখানে যেতে সাহস হলো না, আমি এখানেই এলুম। ডাক্তাররা বলছেন আমার কখন কী হয় তাই তোমাদের কাছাকাছি থাকাই ভালো। আমাকে এবার বড়ো ক্লান্ত করেছে, ভিতরে-ভিতরে দুর্বল বোধ করছি, মনে হচ্ছে যেন সামনে একটা বিপদ অপেক্ষা ক'রে আছে।"*

জীবনের শেষ প্রহরেও তাঁর সৃজনীশক্তি ক্ষুন্ন হয়নি এতটুকু। কালিম্পংয়ে সপ্তাহখানেক অত্যন্ত ভালো ছিলেন কবি। দীর্ঘদিনের অবসন্নতা কেটে গিয়ে তাঁর মন আলো আর রঙের আনন্দধারায় স্নান করছিল নিয়ত। ২৫ শে সেপ্টেম্বর সকালে, খোলা দ্বার আর বাতায়ন দিয়ে উদার, ঋজু হিমালয় দেখতে দেখতে লিখলেন:

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।

---

[১]রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব

হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ,
জানে তা কি এ কালিম্পঙ।
ভান্ডারে সঞ্চিত করে পর্বতশিখর
অন্তহীন যুগ-যুগান্তর।
আমার একটি দিন বরমাল্য পরাইল তারে,
এ শুভ সংবাদ জানাবারে
অন্তরীক্ষে দুর হতে দুরে
অনাহত সুরে
প্রভাতে সোনার ঘণ্টা বাজে ঢঙ ঢঙ,
শুনিছে কি এ কালিম্পঙ।

পরদিন, ২৬শে সেপ্টেম্বর সকালে তাঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল শরীর ভালো না। স্থানীয় ডাক্তার গোপালবাবুকে ডাকা হ'ল – তিনি দেখে শুনে বলে গেলেন ভয়ের কিছু নেই, সামান্য হজমের গোলমাল সম্ভবত এবং সাধারণ ওষুধেই আরাম বোধ করবেন। সেদিন সকালেই মংপু থেকে এসে পৌঁছেছেন কবির পরম স্নেহভাজন মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর শিশুকন্যাকে নিয়ে। তাদের দেখে রবীন্দ্রনাথ দারুণ খুশী, সাময়িকভাবে তাঁর চেহারা থেকে অসুস্থতার চিহ্ন উধাও যেন। সদ্য শেষ করেছেন ল্যাবরেটরি গল্পটি, উৎসাহ ভরে নিয়ে এলেন পাণ্ডুলিপি প্রতিমা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবীকে শোনানোর জন্য। পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন শারীরিক দুর্বলতা, পাণ্ডুলিপি মৈত্রেয়ী দেবীর হাতে দিয়ে বললেন "বড়োই ইচ্ছা ছিল গল্পটা তোমাদের প'ড়ে শোনাবো, বৌমাও শুনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে আর আমার দ্বারা হলো না, প'ড়ে নিও।"

দুপুরে অল্প খাওয়ার পর, গোপাল ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে খাটে গিয়ে শুলেন কবি। পাশের ঘরে বাকিরা খেতে বসেছেন, এমন সময় বালক সেবক কানাইয়ের চিৎকারে প্রতিমা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী ছুটে গেলেন গুরুদেবের ঘরে। দেখলেন তাঁর মুখ টকটকে লাল, চেতনা আচ্ছন্ন, পরম কাছের মানুষকেও তখন চিনতে পারছেন না অন্তর্দৃষ্টিসক্ষম মহাপুরুষ। আবার ছুটে এলেন গোপাল ডাক্তার, স্থানীয় হাসপাতালের ডাক্তারকে সঙ্গে করে। দুজনে ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন রোগ হজমের সমস্যার চেয়ে গুরুতর, গুরুদেব ইউরেমিয়ায় ভুগছেন এবং আশু অপারেশন ছাড়া পন্থা নেই। সে রাত কাটল গ্লুকোস আর ডাবের জল খেয়ে, কিন্তু পরের দিন সকাল থেকে আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন গুরুদেব। শান্তিনিকেতন এবং কলকাতায় ট্রাঙ্ক কল করা হল। মৈত্রেয়ী দেবী দার্জিলিংয়ে যোগাযোগ করে সে রাতেই এক বড় সাহেব ডাক্তারকে আনার ব্যবস্থা করেছেন। সারা দিন কাটল গভীর আশঙ্কায়, কবি ক্রমশই নেতিয়ে পড়ছেন, দুপুর থেকে গায়ে জ্বর ১০২। রাত আটটা নাগাদ এলেন সাহেব ডাক্তার – প্রথমেই প্রশ্ন, "ইনিই কী সেই ডক্টর টেগোর" ? বুকে যন্ত্র লাগিয়ে পরীক্ষা করার জন্য পাঞ্জাবীর বোতাম খুলে দিলে, কবির চওড়া, বলিষ্ঠ দেহ দেখে আশ্চর্য হয়ে মন্তব্য করলেন, "What a body Dr Tagore has!"

পরীক্ষা শেষ করে সাহেব ডাক্তার জানালেন সেই রাতেই গুরুদেবের অপারেশন করা উচিৎ, নচেৎ প্রাণ সংশয় হতে পারে। গোপাল ডাক্তারও সহমত সাহেবের সাথে। প্রতিমা দেবী পড়লেন বিষম সঙ্কটে। রথীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য কাছের মানুষ, কলকাতার বিশিষ্ট ডাক্তারদের পরামর্শ বিনা, সুদূর নির্জন পাহাড়ে, অপারেশন-এর সঠিক সরঞ্জাম, বন্দোব্যস্ত ছাড়া অজানা, ডাক্তারের হাতে তুলে দেবেন এক মহাজীবনের বাঁচা মরার দায়িত্ব ? আর যদি না বলেন, এবং তার ফলে কোনো নিদারুণ পরিণতি ঘটে যায় সেই আশঙ্কাও ভয়াবহ। সহসা তাঁর মধ্যে এক গভীর বিশ্বাস, বোধ কাজ করল

"বাবামশায়ের ভবিতব্য কখনো এমনভাবে শেষ হতে পারে না, তাঁর মধ্যে যে ঐশ্বরিক শক্তি আছে তা এত সহজে নিঃশেষ হবার নয়।" তিনি দৃঢ় ভাবে সাহেবকে জানালেন যে আগামীকাল রথীন্দ্রনাথ এবং প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ কলকাতা থেকে ডাক্তার নিয়ে পৌঁছবেন, তাঁদের আসা অবধি অপারেশন করা অপেক্ষা করতে হবে। সাহেব ডাক্তারের খুব ইচ্ছে যে সে রাতেই অপারেশন করেন – এত বিখ্যাত রুগী তো সহজে পাবেন না, বিরক্ত হয়ে ভয় দেখালেন – "do you know Mrs Tagore, you are taking a huge risk for 12 hrs, you do not know what may happen tomorrow"। ভয়াবহ আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠেছিল প্রতিমাদেবীর – কিন্তু শেষ পর্যন্ত অটল থাকলেন সিদ্ধান্তে, আর একদিন অপেক্ষা করতেই হবে কলকাতা থেকে প্রশান্তচন্দ্র ও রথীন্দ্রনাথের ডাক্তার নিয়ে আসা অবধি। দমে গিয়ে, ওষুধ দিয়ে বিদায় নিলেন সাহেব এবং বলে গেলেন দরকার হলেই তাঁকে ডাক পাঠালে তিনি সব কাজ ফেলে ছুটে আসবেন ডক্টর টেগোরকে দেখতে ।

২৭-শে সেপ্টেম্বর সারা রাত কাটলো নিদারুণ আশঙ্কায়, প্রায় চেতনাহীন কবি, মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রণায় অস্ফুট শব্দ নির্গত হচ্ছে অচেতন মহামানবের মুখ থেকে। প্রতিমা দেবী স্মৃতিচারণ করছেন, *"সে যেন একটা ঝড়ের রাত। নিয়তির উপর নির্ভর ক'রে দাঁড়িয়ে আছি, ঝোড়ো সমুদ্রে যে-জাহাজ ডুবুডুবু তারই দিকে অসীম ভরসায় তাকিয়ে, মন তখন আতঙ্কে স্তব্ধ, কেবল ভরসা হচ্ছে বাবামশায়ের অপূর্ব জীবনীশক্তি তাঁকে এই দুর্যোগের রাত পার করিয়ে দেবে। ভোরের দিকে মৈত্রেয়ীতে আমাতে অস্ফুট আনন্দধ্বনি ক'রে উঠলুম, তাঁর চেতনা ফিরে এসেছে এবং অন্য সব লক্ষণ ভালো দেখা দিয়েছে। তিনি আমাদের চিনতে পারলেন ... কালরাত্রি শেষ হল, আকাশে তখন আলো ফুটে উঠছে ধীরে-ধীরে।"*

একটু বেলা হতে না হতে প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ, কবিকন্যা মীরাদেবী পৌঁছে গেছেন তখনকার বিখ্যাত তিন ডাক্তার ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকার, ডাঃ অমিয়নাথ বসু এবং ডাঃ সত্যসখা মৈত্রকে নিয়ে। সাথে সাথে গ্লুকোস ইঞ্জেকসন দেওয়া হ'ল এবং কিছুক্ষণ পর ইঞ্জেকসনের ভাল প্রতিক্রিয়া দেখে ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত নিলেন সেদিনই তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হবে। এম্বুলেন্স সাথেই এসেছিল, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই কবি রওনা দিলেন শিলিগুড়ি হয়ে রাতের বিশেষ ট্রেনে কলকাতার উদ্দ্যেশে। *" ... তার পরদিন জোড়াসাঁকোতে পৌঁছে দোতলার পাথরের ঘরে তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হল । তখন তাঁর চেতনা অল্প ফিরে এসেছে, বললেন, "এ কোথায় আমাকে আনলে বৌমা।" কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলুম। বললুম, "এ যে আপনার পাথরের ঘর।" তিনি ব'লে উঠলেন, "হ্যাঁ, পাথরই বটে, কী কঠিন বুক, একটুও গলে না। "আমি নীরবে তাকিয়ে রইলুম।"*

জোড়াসাঁকোয় দু'মাসের ওপর প্রাণ সংশয় নিয়ে রোগের সাথে যুদ্ধ চলেছিল, অসহ্য কষ্ট পেয়েছিলেন কবি। আটজন ডাক্তারের এক কমিটি তৈরী করা হল এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিচর্যায় নভেম্বর থেকে রবীন্দ্রনাথের অবস্থার প্রভূত উন্নতি দেখা গেল। ডাক্তাররা বললেন বিপদ কেটে গেছে তখনকার মত। কমিটিতে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনা হল তখনই অপারেশন করা সঙ্গত হবে কি না। ডাক্তার নীলরতন সরকারের আপত্তিতে তখনকার মত স্থগিত রইল। তখনও কবি অসুস্থ, দুর্বল (আর কোনদিনই রোগীর অসহয়তা থেকে মুক্তি হবে না তাঁর)। এর মধ্যে এল ভাইফোঁটা। গুরুদেবের এক দিদি, বর্ণকুমারী দেবী তখনও জীবিত – তিনি এলেন আশি বছরের ভাইকে ফোঁটা দিতে। কবির তখনো উঠে বসার মতো অবস্থা নয়। দুজনে বর্ণকুমারী দেবীকে ধরে ধরে বিছানায় কবির পাশে জায়গা করে দিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধা কম্পমান, শীর্ণ হাতে ফোঁটা এঁকে দিলেন ভগিনীর কাছে স্নেহের কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রশস্ত কপালে। ভাইয়ের বুকে, কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভাইকে তীব্র শাসন করলেন, "দেখো রবি, তোমার এখন বয়েস হয়েছে, এক জায়গায় বসে থাকবে, অমন ছুটে ছুটে আর পাহাড়ে যাবে না কখনো বুঝলে?" বিশ্ববিখ্যাত, জগৎময় বন্দিত ভাই সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দিদিকে আশ্বাস দিলেন গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে, "না, কক্ষনো আর ছুটে ছুটে যাবো না, বসে বসে যাবো এবার থেকে।" উপস্থিত সকলের হাসি চাপা দায়।

তাঁর সৃজনশীলতা তখনও ঝর্ণার মত নানা পথে প্রকাশ পাচ্ছে, নিজে লেখার ক্ষমতা না পেলেও মুখে মুখে ছড়া, কবিতা লেখা চলছে প্রতিদিন, সেই সময় আশেপাশে যাঁরা থাকতেন তাঁরা টুকে নিচ্ছেন সেসব রচনা। সেসময়ে লেখা বেশির ভাগ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল 'রোগশয্যায়' কাব্যগ্রন্থে। বইটি উৎসর্গ করেছিলেন রোগশয্যায় তাঁর দুই একনিষ্ঠ তরুণ সেবিকা, শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালিনী[২] ও শ্রীমতী অমিতা ঠাকুরকে[৩]।

বিশ্বের আরোগ্যলক্ষ্মী জীবনের অন্তঃপুরে যাঁর
পশু পক্ষী তরুতে লতায়
নিত্যরত অদৃশ্য শুশ্রূষা
জীর্ণতায় মৃত্যুপীড়িতেরে
অমৃতের সুধাস্পর্শ দিয়ে
রোগের সৌভাগ্য নিয়ে, তাঁর আবির্ভাব
দেখেছিনু যে-দুটি নারীর
স্নিগ্ধ নিরাময় রূপে,
রেখে গেনু তাদের উদ্দেশে
অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা।

নভেম্বর-এ ডাক্তাররা মত দিলেন গুরুদেবকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়ার। শান্তিনিকেতনের প্রিয় পরিবেশ, খোলা হাওয়া, শীতের নতুন আমেজে প্রথমেই কবির দেহ-মনকে সতেজ করে তুলল। সবার আশা হ'ল হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই আবার আগের মত চলে-ফিরে বেড়াবেন তাঁর প্রিয় তপোবনে। সে আশা আর পূর্ণ হয়নি। শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার পর থেকে দেহসংক্রান্ত ছোটখাটো ব্যাপারেও অন্যের সেবায় নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন চিরদিন আত্মনির্ভর মানুষটি। নিজের গোপনীয় প্রয়োজনের ব্যাপারে সঙ্কোচময় মহাপুরুষকে অনেক ব্যাপারে ছোট শিশুর মতো লালন করতে হত। নিজেই রসিকতা করলেন, *"আমি ছ-মাসের গ্লাক্সো বেবী হয়ে গেছি।"* রোগযন্ত্রণার মধ্যেও হাসিতে, গল্পে, রসিকতায় আশে পাশের সকলকে সজীব রেখেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী পুরুষ।

অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি – যে যেমন বলেন সবরকমই চিকিৎসা মেনে নেন গুরুদেব । মুখ বুঝে অসহ্য কষ্ট সহ্য করে চলেন দিনের পর দিন, একমাত্র শেষ আশা অপারেশন। কিন্তু অপারেশনে তাঁর প্রবল আপত্তি। বলেন, *"শনি যদি একটা কিছু ছিদ্র খোঁজে, সে যদি আমার মধ্যে রন্ধ্র পেয়েই থাকে – তাকে স্বীকার করে নাও। মিথ্যে তার সঙ্গে যুঝে লাভ কি ? মানুষকে তো মরতে হবেই একদিন। এক ভাবে না এক ভাবে এই শরীরের শেষ তো হতে হবে, তা এমনই করেই হোক না শেষ। ক্ষতি কী তাতে? মিথ্যে এটাকে কাটাকুটি, ছেঁড়াছিঁড়ি করার কী প্রয়োজন ? তাঁর দেহ অক্ষতভাবেই তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া ভালো।"*

দেখা যাক – আরও কয়েকদিন, এইভাবে কাটলো। শরীরের নিদারুণ কষ্ট সত্ত্বেও সৃষ্টির অবসান নেই এই সময়ে। সকলবেলায় বারান্দায়, অপরাহ্নে ঘরের জানলার ধারে বসিয়ে দেওয়া হয়। ভোরের বেলা নাতনী নন্দিতা এসে হাত মুখ ধুইয়ে, চুল আঁচড়ে চশমা পরিয়ে দেয়। সেইসময় একদিন সকৌতুকে নন্দিতার উদ্দেশে মুখে মুখে রচনা করলেন এই ছড়াটি :

ওরে মোর দোস্ত
আজকে সকালবেলা মেজাজটা খোশ তো,

[২]মীরা দেবীর কন্যা।

[৩]নাতবৌ, কবির বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র অজীন্দ্রনাথের স্ত্রী।

একটু সময় নিয়ে কাছে তুই বোস তো,
কেন তুই চলে যাস, করি নাই দোষ তো ।।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ শান্তিনিকেতনে পালন করা হল গুরুদেবের জন্মবার্ষিকী। রানী মহালনবিশের স্মৃতিকথা থেকে তাঁদেরকে পাঠানো ছাপানো নিমন্ত্রণ পত্রের অন্য পিঠে রথীন্দ্রনাথের নিজের লেখা বার্তা থেকে অনুষ্ঠানের যথার্থ কারণ বোঝা যায় : *"রানী-প্রশান্ত, শত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও আমরা জন্মোৎসব যাতে অনুষ্ঠিত হয় তার চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতে এইটাই স্মৃতিবার্ষিকী উৎসব হবে – মৃত্যু তারিখে করতে চাই না ..."*

এই দিনে রবীন্দ্রনাথ মানুষকে উপহার দিলেন তাঁর অভিভাষণ, "সভ্যতার সঙ্কট"। তাঁর হয়ে পাঠ করলেন ক্ষিতিমোহন সেন। তাঁর "জন্মদিনে" বইটি বেরোলো, দেশবাসীকে সহস্তে এই তাঁর শেষ উপহার। নববর্ষের সার্বজনীন *জন্মোৎসবের* পর, ১৯৪১-এর কবির জীবদ্দশায় শেষ ২৫-শে বৈশাখও পালন করা হল অনাড়ম্বর ভাবে। তখন শান্তিনিকেতনে যথেষ্ট গরম। সন্ধ্যেবেলা উদয়নের পুবদিকে আঙিনায় সামিয়ানা বেঁধে চাতালের ওপর ছাত্র-ছাত্রীরা অভিনয় করল "বশীকরণ"। কবি একধারে আরামচৌকিতে বসে দেখলেন এবং উপভোগ করলেন। কবির প্রিয় সেবক, বনমালী সেদিন "পুরাতন ভৃত্য" ভূমিকাতেই অভিনয় করেছিল এবং এতদিনের সেই আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তার প্রণাম প্রভুর পায়ে সেদিন পৌঁছে দিয়েছিল। অভিনয়ের পর সবার প্রশংসা শুনে বনমালী এক গাল হেসে বললেন, *"বাবাঃ ! আমি কক্ষনো কিছু করি নাই, তার উপর সামনে বাবামশাই চৌকিতে বসা। আমার তো কথা বলার সময় গলা বুজে যাবার মতো হচ্ছিল।" কবি সকলকে বললেন, "আমার লীলমণির*[4] *কত গুণ তাই দেখো । বাঁদরটা আমার কাছে থেকে নাটক করতেও শিখে গেল।"*

ক্রমেই কবির অবস্থা দিন দিন অবনতি ঘটছে। আঙ্গুল আরও অসাড় হয়ে গেছে, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাকবি আর কলম ধরতে পারেন না। ১৯৪১, জুন মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতা থেকে এলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ ইন্দুভূষণ বসু, ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী, ডাঃ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা সবাই মিলে বোঝালেন গুরুদেবকে – এই অপারেশন এত সহজ, এতে ভয়ের কোনই কারণ নেই, অপারেশন করলে ভালই হবে এবং এ যন্ত্রণার থেকে রক্ষার এই একমাত্র পথ ইত্যাদি। গুরুদেব মুখে কিছু বললেন না আর সবাই মেনে নিল অপারেশন অনিবার্য।

১৯৪১ সাল, ২৫শে জুলাই কবির কলকাতা যাওয়ার দিন স্থির হয়েছে। ২৪শে জুলাই থেকে কবি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন। বনমালীকে ডেকে বলছেন, *"জিনিসপত্র যা লাগে সব ঠিক করে নিস কিন্তু আমার যা যা লাগে।"* রথীন্দ্রনাথ আর অনিলবাবু একদিন আগে চলে যাচ্ছেন, কবি পৌঁছবার আগে ব্যবস্থা করে রাখতে। অনিল চন্দ বিদায় জানাতে গিয়ে প্রণাম করে বললেন, *গুরুদেব আপনার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।"* রবীন্দ্রনাথ বললেন, *"গাড়ির ব্যবস্থা না মারবার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছ?"* অনিলবাবু ব্যথিত হয়ে, *"ছি, ছি এ কী অন্যায় কথা – এরকম কথা বলা আপনার মোটেই উচিত নয় ..."* ইত্যাদি বলে খুব আপত্তি জানালেন। এবার কবি হেসে বললেন, *"বাঙাল, ঠাট্টাও বোঝে না – না এমন ঠাট্টা করা আমার ভারী অন্যায়।"*

২৫শে জুলাই ভোর চারটায় কবির ঘরে গিয়ে রানী মহালনবিশ দেখলেন, তিনি তখনই পোশাক-আশাক পড়ে তৈরি হয়ে পুবের জানলার কাছে বসে আছেন। একটু পরে আশ্রমের ছেলে মেয়ের দল, *"এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিলে দ্বার ..."* গাইতে গাইতে উদয়নের ফটক পার হয়ে কবির জানলার নিচে এসে দাঁড়ালো। কবি জানলার ধারে বসে তাদের সঙ্গীতের অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন। অসুস্থ হওয়ার পর থেকে ছেলেমেয়েদের কবির কাছে আসার নিষেধ ছিল তাঁর শরীরের ক্ষতি হবে বলে, এতদিনে তারা আবার সুযোগ পেল আচার্যকে গান শোনানোর। আজ ক্ষণিক পরেই তিনি

[4]প্রিয় ভৃত্যকে দেওয়া কবির স্নেহের সম্ভাষণ।

বিদায় নেবেন, কেউ জানে না আর তিনি আশ্রমে ফিরবেন কী ফিরবেন না – বৈতালীকের গানের সুরে সেই অনুচ্চারণীয় ব্যাকুলতা ফুটে উঠলো ।

ক্রমে যাত্রার সময় এগিয়ে এল। কবিকে একটা স্ট্রেচারে শুইয়ে বাসে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, চোখে তাঁর কালো রোদ চশমা। সামনের গাড়িতে মীরাদেবী ও রানী মহালনবিশ। অসুস্থ প্রতিমা দেবী যেতে পারেননি, তিনি রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলেন আশ্রমের ছেলে মেয়েরা সমবেত কণ্ঠে গাইছে, *"আমাদের শান্তিনিকেতন – আমাদের সব হতে আপন ... ।"* মহর্ষি আচার্যকে তাঁর প্রিয় আশ্রমের উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের শেষ বিদায় প্রণতি।

ট্রেনে কবির জন্য একটা বিশেষ "সেলুন কার" ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাতে একটা বসবার এবং তার পাশে শোবার ঘর। প্রথমে কবি বসার ঘরে জানলার পাশে বসলেন তাঁর প্রিয় বাংলার দৃশ্যপট দেখতে দেখতে যাবেন বলে। অজয় নদী পার হবার সময় নন্দিতা দেবী বললেন, "দাদামশাই, অজয় পার হচ্ছ।" নিজের মনেই যেন বললেন কবি, *কতদিন পরে দেখলুম নদীটা।* একটু পরেই ক্লান্ত বোধ করতে লাগলেন, সকলে ধরে এনে শোওয়ালেন পাশের ঘরে বিছানায়। হাওড়া পৌঁছনো অবধি পুরো পথ এলেন শুয়ে শুয়েই। গাড়িতে খাওয়ার জন্য চিঁড়ে-দই দিয়ে মণ্ড করে আনা হয়েছিল, মাঝে মাঝে তাই খাওয়ানো হয়েছে কবিকে।

বর্ধমান স্টেশনে নিবারণবাবু খবর নিতে এলেন, কেমন আছেন, কোনো কষ্ট হচ্ছে কিনা। গুরুদেব বললেন, "না, বেশ আছি, দিব্যি 'মুন্ডু' খেতে খেতে চলেছি।" নিবারণবাবুর অবাক দৃষ্টি দেখে মীরাদেবী হেসে বোঝালেন, "মণ্ড খাওয়ানো হচ্ছে, বাবা তার নাম দিয়েছেন মুন্ডু।" অসুস্থ, পথশ্রমে ক্লান্ত শরীরেও মনের সজীবতা দমাতে পারেনি ।

কবির আগমনের কথা যথাসম্ভব গোপন রাখা হয়েছিল, হাওড়া স্টেশনে ভিড় ছিল না। একটা বড় বাসে করে স্ট্রেচার সমেত গুরুদেব এলেন জোড়াসাঁকো বাড়িতে। যে স্ট্রেচারে এসেছেন, তাতে সেইভাবেই শুয়ে – ক্লান্তিতে খাটে ওঠানো গেল না । অপারেশান-এর জন্য ঘরদোর ঝকঝকে, কবিকে পাথরের ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়ানো হল। বিকেলে দু একজন কাছের মানুষ এসেছিলেন দেখা করতে, কারুর সাথে বিশেষ কথাবার্তা বলতে পারলেন না, ঝিমিয়ে রইলেন। সন্ধ্যের দিকে খানিকটা ঘুমোলেন ঐ স্ট্রেচারে শুয়েই। সাড়ে সাতটা নাগাদ নিজের মনেই বলে উঠলেন, কী জানি, ভাল লাগছে না আমার। ঘরে উপস্থিত রানী চন্দ তা শুনে ব্যাকুল হলেও প্রকাশ করলেন না, তাঁর জন্য কেউ উতলা হয়ে পড়বে গুরুদেবের কোনোদিন তা পছন্দ নয়। রানী চন্দ ঈশারায় এক সুযোগে ডেকে বললেন রথীন্দ্রনাথকে। রথীন্দ্রনাথ এমনিই আসার ভান করে ঘরে এলেন, সঙ্গে ডাঃ রাম অধিকারী। ডাক্তার গুরুদেবের নাড়ি দেখে, ওষুধ খাইয়ে বললেন ভয়ের কিছু নেই, পথশ্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। রাতে ধরাধরি করে তুলে খাটে শোয়ানো হল। বেশ ভাল ঘুমোলেন সে রাতে।

পরদিন ২৬শে জুলাই – গুরুদেবকে অনেক প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। রাতে ঘুম হয়ে ক্লান্তি অনেক কম, সকলের সাথে অল্প বিস্তর কথা বলছেন। অবনীন্দ্রনাথ গতকাল উঁকি মেরে ঐ অবস্থায় দেখে বারান্দায় এ-মাথা থেকে ও মাথা ঘুরে ছটফট করতে করতে ফিরে গিয়েছিলেন, আজ খুড়োকে ভাল দেখে তাঁর আনন্দের সীমা নেই। রবীন্দ্রনাথের ঘরে গেলেন হাসতে হাসতে – ৮০ বছরের খুড়ো আর ৭০ বছরের ভাইপো অন্তরঙ্গ হয়ে গল্প করলেন কিছুক্ষণ। "ঘরোয়া" পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সদ্য লিখেছেন অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "এমন আর কারো দ্বারা সম্ভব হত না। সবাই আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করেছে, স্তুতি করতে গিয়ে আসল আমাকে ধরতে পারেনি। তোমার মুখ দিয়ে এতদিনে সবাই জানবে তোমার রবিকাকাকে।"

বিকেল সাড়ে চারটেয় সত্যেন ডাক্তার গ্লুকোস ইঞ্জেকশন দিতে এলেন ডান হাতের শিরায় (intravenous)। ডাক্তার চলে গেলে রানী মহালনবিশ নুনের পুঁটুলি করে সেঁক দিচ্ছেন, কবি মজা করে রানী চন্দকে বলছেন – "দ্বীতিয়া[৫],

[৫]কবি কৌতুক করে রানী চন্দকে প্রথমা, রানী মহালনবিশকে দ্বীতিয়াবলে সম্বোধন করতেন মাঝে মাঝে।

গেল সব জ্বলিয়া।" বলতে বলতেই সারা শরীরে লাগল কাঁপুনি। তিন চারজন কম্বল চাপা দিয়ে ধরে আছেন, ঠকঠক কাঁপছেন গুরুদেব। উপস্থিত ডাক্তাররা ব্যস্ত, বললেন গ্লুকোস ইঞ্জেকশন-এর কারণে কাঁপুনি। প্রায় ১০৩ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন আধঘণ্টা পর, সারারাত কাটল আচ্ছন্নতায়।

২৭শে জুলাই। গুরুদেবের ঘুম ভাঙল, মুখ প্রসন্ন। রানী চন্দকে ডেকে মুখে মুখে একটা কবিতা বললেন। একটু পরে রানী মহালনবিশ এলে তাঁকে বললেন, "জানো, আজও আর একটা কবিতা হয়েছে সকালে। এ কী পাগলামি বল তো ? প্রত্যেকবারই ভাবি এই বুঝি শেষ, কিন্তু তারপরে দেখি আবার একটা বেরোয়" – এ লোকটাকে নিয়ে কী করা যাবে। দৈববানীর মত সেদিনের কবিতাটি ছিল :

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে –
কে তুমি মেলে নি উত্তর।

বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় –
কে তুমি,
পেল না উত্তর।

কবির মেজাজ প্রফুল্ল, বললেন, "ডাক্তাররা আমায় নিয়ে বেজায় বিপদে পড়েছে। হার্ট দেখে, লাংস দেখে কোথায় কোনো দোষ খুঁজে পাচ্ছে না। রুগী আছে, অথচ রোগ নেই, ওর চিকিৎসা করবে কার – এতে ওদের মন খারাপ হবে না, বলো দেখি?" গতকালের কাঁপুনির রহস্য, অর্থাৎ গ্লুকোস ইঞ্জেকশন-এর প্রতিক্রিয়ার জন্য অমন কাঁপুনি বলা হয়নি কবিকে। লোকজন কমে গেলে, একান্তে রানী মহালনবিশকে বললেন, "... কাল ঐ খোঁচাটার জন্যই কাঁপুনি হল, কেমন? ... আঃ, ব্যাপারটা চুকে গেলে বাঁচি, তাহলে রোজ রোজ এই ক্ষুদে ক্ষুদে খোঁচাগুলি বন্ধ হয়ে যাবে।"

গত একবছর অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় আধশোয়া হয়ে ঘুমোতেন কবি। বিছানায় কোমর থেকে ঘাড় অবধি অনেকগুলো বালিশ জড়ো করে রাখা হত, হাঁটুর নীচেও সবসময় একটা মোটা বালিশ থাকত। অপারেশনের পর কয়েকদিন সোজা হয়ে শুয়ে থাকতে হবে, তাই ডাক্তাররা নির্দেশ দিলেন এখন থেকে এক আধটা বালিশ কম করে অভ্যেস করানোর। রানী চন্দ বিকেলে পায়ের নীচের বালিশ ঠিক করতে গেলে তাঁকে বললেন, "আর কেন ? পা তুলে থাকা আমার আর চলবে না গো, উঁচু ঘাড়ও আর সাজবে না। যে ঘাড় কোনোদিন নামই নি, আজ ডাক্তাররা বলছে, ঘাড় নামাও – কী অধঃপতন আমার হল বল দেখি।"

২৯শে জুলাই। কবিকে জানানো হয়নি পরেরদিন অপারেশনের দিন স্থির হয়ে গেছে। জ্যোতিডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হে জ্যোতি, কবে দিন ঠিক হল ?" জ্যোতিডাক্তার প্রশ্নটা এড়িয়ে যান, এ'কথা সে'কথা বলেন, অপারেশনের সঠিক দিন জানান না পাছে গুরুদেব বিচলিত হয়ে পড়েন। কবি শুনেছেন তাঁকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান করা হবে না, লোকাল এনসথেটিক দিয়ে অপারেশন হবে। সংবেদনশীল কবির পক্ষে ঘটনাটি সুখকর ছিল বলে মনে হয় না এবং সজ্ঞানে তিনি যখন উপলব্ধি করবেন যে তাঁর অনাবৃত নিমন্নাঙ্গে ডাক্তাররা অপারেশন করছেন, কারুর কারুর মতে সেই

অভব্যতা কবিকে নিদারুণ মর্মাহত করেছিল। এদিন বিকেলবেলাও কবি মুখে মুখে একটি কবিতা রচনা করলেন, রানী চন্দ লিখে নিলেন। তাঁকে পড়ে শোনানোর সময় রানী চন্দ বকুনি খেলেন, এখানটা কী হয়েছে, ছন্দ মিলল কোথায় ? সংশোধন করলেন শুনে শুনেই। সেদিনের সেই কবিতাটির অংশবিশেষ এইরকম:

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে ;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত
অন্ধকার ছলনার ভূমিকা তাহার
যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়। ....

৩০শে জুলাই। আজ সকালে অপারেশন হবে। পাথরের ঘরের লম্বা বারান্দার দিক ঘেঁষে অপারেশনের টেবিল সাজানো হল। ঘরদোর ডিসইনফেক্ট্যান্ট দিয়ে মোছা হয়েছে, সাদা পর্দা দিয়ে আড়াল করা হয়েছে অপারেশন টেবিল, চারদিকের টেবিলে সার্জারীর যন্ত্রপাতি সাজানো হয়েছে ডাক্তারদের নির্দেশমত। সবকিছুই হচ্ছে গুরুদেবকে না জানিয়ে। আজও জিজ্ঞেস করলেন জ্যোতি ডাক্তারকে, "আমাকে বলো তো, ব্যাপারটা কবে করছ তোমরা ?" জ্যোতি ডাক্তার আমতা আমতা করে বললেন, "এই তো, কাল কি পরশু – এখনো ঠিক হয়নি।" রানী মহালনবিশ সমর্থন করেননি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই লুকোচুরি। তাঁর মতে, কি জানি এতটা লুকোবার কি দরকার ছিল ? ... অনিশ্চিতের চেয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু জানলে – তা সে যত বড়ো বিপদই হোক, কবির মতো মন সহজে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে পারে।

কবি সকাল থেকে চুপ করে আছেন। এক সময় রানী চন্দকে ইশারায় ডেকে বললেন লেখো। তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন, রানী চন্দ লিখে নিলেন ...

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তা'রে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভান্ডারে।

বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন কবি। অনেকক্ষণ বুকে দু হাত জড়ো করে চুপচাপ চোখ বুঝে রইলেন। সাড়ে ন'টা নাগাদ আবার রানী চন্দকে বললেন, লিখে নে শেষটা :

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

বেলা দশটার সময় আবার মুখে মুখে বলে রানীকে দিয়ে চিঠি লিখলেন স্নেহের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে, যিনি অসুস্থতার জন্য শান্তিনিকেতন থেকে আসতে পারেননি। চিঠি শেষ হলে গুরুদেবের হাতে দেওয়া হল, বাড়ানো হল কলম – কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠির নীচে সই করলেন, বাবামশায়।

সাড়ে দশটায় ডাঃ ললিতমোহন খুব সহজ ভাবে গুরুদেবের ঘরে এলেন, বাইরে আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে যেন ঝকঝকে দিন দেখে তখনই মনে এল বললেন, আজ দিনটা ভালো আছে, তা'লে আজই কাজটা সেরে ফেলা যাক – কী বলেন? গুরুদেব একটু হকচকিয়ে গেলেন, আজই? তারপর বাকিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তা ভালো, এরকম হঠাৎ হয়ে যাওয়াই ভালো।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। একবার শুধু রানী চন্দকে বললেন, আর একবার পড়ে শোনা তো কি লিখেছি আজ। রানী চন্দ পড়ে শোনালেন। বললেন, কিছু একটা গোলমাল আছে – থাক, ডাক্তাররা তো বলেছে অপারেশনের পর মাথা পরিষ্কার হয়ে যাবে, পরে দেখে ঠিক করে দেব।

এগারোটা কুড়িতে অপারেশন শুরু হল। অপারেশন করলেন ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁকে সাহায্য করলেন ডাঃ সত্যসখা মৈত্র এবং ডাঃ অমিয় সেন। কোনো নার্স রাখা হয়নি। একজন আন্যাসথেটিক প্রস্তুত ছিলেন ক্লোরোফর্ম গ্যাস নিয়ে, কিন্তু প্রয়োজন পড়েনি। সেলাই, ব্যান্ডেজ সব মিলিয়ে বড়জোর আধঘন্টার মধ্যে সব ভালো ভাবে শেষ হয়ে গুরুদেবকে আনা হল ঘরে। অপারেশনের পর ঘুমলেন ঘণ্টা দুই, তারপর চোখ মেলে চাইলেন – যথেষ্ঠ স্বাভাবিক মুখের ভাব, গ্লুকোস ইঞ্জেকশন দেওয়া হল।

বিকেলের দিকে বার কয়েক বললেন, জ্বালা করছে। গায়ে সামান্য জ্বর। সন্ধ্যে সাতটার সময় ললিতবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "অপারেশনের সময় আপনার কী লেগেছিল ?" গুরুদেব বললেন, "কেন মিছে কথাটা বলাবে আমাকে দিয়ে।" তারপর বললেন, "জ্যোতিকে একবার জিজ্ঞেস করতে চাই – সে যে আমাকে এত বোঝাল কিছু টেরটিও পাব না, তার মানে কী।" এত কষ্টের মধ্যেও গুরুদেবের কথায় হাসি-ঠাট্টার সুর অমলিন সবার মনে মেঘ কেটে গেল অনেকখানি। সেদিন রাতে ভালো ঘুম হল কবির ।

১লা অগস্ট

দু-দিনের মধ্যে হাওয়া বদলে গেল। গুরুদেব অসাড় হয়ে, চোখ বুঝে শুয়ে আছেন। মাঝে মাঝে আঃ-উঃ, জ্বালা করছে ইত্যাদি যন্ত্রনাসূচক শব্দ বেরিয়ে আসছে প্রায় অচেতন দেহ থেকে। অল্প অল্প জল, ফলের রস খাওয়ানো হচ্ছে। ডাক্তাররা চিন্তিত, সারাদিন তাদের ফিসফিসানি, বন্ধ ঘরে আলোচনা চলছে। দুপুর থেকে হিক্কা শুরু হল, সবার মধ্যে ভয়ের ছাপ, ডাক্তাররা সঠিক কিছু ধরতে পারছেন না। সন্ধ্যেবেলা রানী মহলানবিশকে দেখে বললেন, "একটা কিছু করো ? তুমি তো হেড-নার্স – দেখতে পাচ্ছো না কী রকম কষ্ট পাচ্ছি?" কাছেই দাঁড়ানো সুধাকান্তবাবু সান্তনা দিতে গেলেন, বললেন, "এইতো এইমাত্র ইন্দুবাবু দেখে ওষুধ দিয়ে গেলেন, এটা খেলেই কমে যাবে।" খুব বিরক্ত হয়ে গুরুদেব বললেন, "কিচ্ছু কমবে না। ওরা যে কিচ্ছু বুঝতে পারছে না আমি তা টের পেয়েছি, কেবল আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছে।"

২রা অগস্ট

বেশির ভাগ সময় আচ্ছন্ন কাটালেন। সকালে খাওয়াতে গেলে বিরক্ত হলেন – আঃ, আমাকে আর জ্বালাস না তোরা। একজন ডাক্তার জানতে চাইলেন, কি রকম কষ্ট হচ্ছে আপনার। স্নিগ্ধ, ক্লান্ত হেসে বললেন কবি, এর কি কোনো বর্ণনা আছে ?

বিধানচন্দ্র রায় মাথা নীচু করে রুগীর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে মীরাদেবী, রানী মহালনবিশকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন, একটু থেমে বললেন, বাড়ির মেয়েরা তো কতরকম টোটকা ওষুধ জানে, তোমরা দাও না যদি কোনো টোটকা জানা থাকে হিক্কা থামাবার জন্য। সবাই নির্বাক – যখন ডাঃ বিধান রায় টোটকার ওপর ভরসা করতে চাইছেন তার অর্থ বুঝে নিতে অসুবিধা হল না কারুর। দম আটকে আসতে লাগল সবার।

ডুবন্ত মানুষের মত খড়-কুটো আঁকড়ে ধরতে চাইছেন সবাই। কবির স্নেহধন্যা, স্যার নীলরতন সরকারের ভাগ্নী, বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্রের স্ত্রী, নিজেও উচ্চশিক্ষিতা ও বিদুষী রানী মহালনবিশ – কোথায় শুনেছিলেন ময়ূরের পালক পুড়িয়ে মধু দিয়ে সেই ছাই মেড়ে গুলি করে খাওয়ালে হিক্কা কমে। বীডন স্ট্রীটে ছুটলেন ময়ূরের পালক কিনতে। জোড়াসাঁকোর লালবাড়ির ছাদে বসে ময়ূর পালক পুড়িয়ে ওষুধ তৈরি হল। বৃথাই সব আশা, প্রচেষ্টা – হিক্কা সমানে চলল, তার সাথে মাঝে মাঝে কাশির দমক। ক্রমশই নেতিয়ে পড়ছেন নশ্বর শরীরে জন্ম নেওয়া মহামানব। সারা রাত কাটল এইভাবেই।

৩রা অগস্ট

সকলেই বুঝছেন গুরুদেবের অবস্থা সঙ্কটজনক। ডাক্তারদের আশা পূর্ণ হয়নি। অপারেশনের পর কিডনী ঠিকমত কাজ করছে না, বহু শতাব্দীর সঞ্চিত যে তীক্ষ্ণ মনন নিয়ে জন্মেছিলেন, সেই অলৌকিক চৈতন্য ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে। শান্তিনিকেতনে ট্রাঙ্ক কল করা হল প্রতিমাদেবীকে তাড়াতাড়ি চলে আসার জন্য। প্রতিমদেবীও খুব অসুস্থ – কিন্তু ডাঃ শচীন সেন এবং কৃষ্ণ কৃপালিনী[৬]-র সাথে সেদিন সন্ধ্যেবেলায় গাড়িতেই পৌঁছলেন জোড়াসাঁকো। সারা রাত কাটল পরম আশঙ্কায়। গুরুদেবের অচেতন শরীর থেকে মাঝে মাঝে কাতরানোর শব্দ সমবেত কান্নার মত জোড়াসাঁকোর বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরতে লাগল।

৪ঠা অগস্ট

ভোরবেলা সামান্য দু-একটা কথা বললেন। প্রতিমা দেবী কানের কাছে গিয়ে বললেন, আমি এসেছি, আপনার মামণি। তখন আগের মতো প্রসন্ন দৃষ্টিতে একবার তাকালেন আদরের বৌমার দিকে, আনন্দে ভরে উঠল প্রতিমা দেবীর বুক – পরমারাধ্য, পিতৃপ্রতিম মহাপুরুষ চিনতে পেরেছেন তাঁকে। প্রতিমা দেবীর হাতে একটু জল খেলেন – সেই শেষ জলদান প্রণম্য শ্বশুরকে।

৫ই অগস্ট

আজ আর কোনো সাড়াশব্দ নেই, সারা দিনই আচ্ছন্ন, অচেতন । বিকেলে স্যার নীলরতনকে নিয়ে বিধান রায় এলেন। কবির অর্ধনিমীলিত, আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে পড়েছে পশ্চিমের আলো। স্যার নীলরতন চুপ করে বসে রইলেন কবির পাশে, কিছু করার নেই জেনেও অভ্যেসবশে নাড়ি দেখলেন, ঘড়ি বের করে শ্বাস প্রশ্বাস শুনলেন – যতক্ষণ ছিলেন সস্নেহে গুরুদেবের ডান হাতের ওপর হাত বুলিয়ে গেলেন।

সবাই জানে অতি ভারী রোগের সামনেও স্যার নীলরতনের অবিচল, মৃদু প্রসন্ন মুখ দেখে কারুর বোঝার উপায় থাকে না অসুখ কত শক্ত। কিন্তু প্রবীণ, ধন্বন্তরী ডাক্তার আজ বন্ধুর রোগশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে যেন সামলাতে পারছেন না, মুখে নিবিড় বেদনার ছবি পরিষ্কার। যাবার সময় স্যার নীলরতন রবীন্দ্রনাথের মাথার কাছ অবধি এসে একবার ঘুরে দাঁড়ালেন, আবার খানিকক্ষণ দেখলেন বহুদিনের সুহৃদকে, তারপর ঘুরে দরজা পেরিয়ে চলে গেলেন। সেই শেষ বিদায় সম্ভাষণের ভঙ্গীটি স্পষ্ট হয়ে গেল সকলের কাছে। আর আশা নেই।

---

[৬]নন্দিতা দেবীর স্বামী, মীরা দেবীর নাতজামাই।

৬ই অগস্ট

সকাল থেকে জোড়াসাঁকো লোকে লোকারণ্য। আজ পূর্ণিমা, যদি কোনোরকমে আজকের দিনটা কাটিয়ে দেওয়া যায় হয়ত ফাঁড়া কেটে যাবে। মীরাদেবী, রথীন্দ্রনাথের মত নিয়ে শেষ চেষ্টা করতে রানী মহালনবিশ ছুটলেন কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কাতীর্থকে অনুনয়-বিনয় করে একটিবার নিয়ে আসার জন্য। কবিরাজ রাজী হলেন, তবে তাঁর শর্ত অ্যালোপ্যাথির এম. বি ৬৯৩ ওষুধ বন্ধ করতে হবে, নাহলে কবিরাজি দাওয়াই কাজ করবে না, হিতে বিপরীত ঘটবে। রানী মহালনবিশ অবোধ শিশুর মত ছুটলেন বিধান রায়ের কাছে অনুমতি নিতে – যদি একটি দিনের জন্য বন্ধ করা যায় এম. বি ৬৯৩, যদি কোনো অলৌকিক উপায়ে পূর্ণিমার রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়। বিধান রায় ক্রুদ্ধ হলেন এমন অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনায়, মত দিলেন না। হতাশ হয়ে ফিরে এলেন রানী মহালনবিশ, শেষ ভরসা হিসেবে কবিরাজকে আনতে পারলেন না। আর কিছু করার নেই, শুধু অপেক্ষা। শান্তিনিকেতনের চিনাভবনের অধ্যাপক কবির পাশে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘণ্টা প্রাচীন চৈনিক মতে জপমালা নিয়ে ইষ্টনাম জপ করে গেলেন ।

৭ ই অগস্ট, ১৯৪১/ ২২-শে শ্রাবণ, ১৩৪৮

কবি পুবশিয়ারি হয়ে শোওয়া, ধীরে ধীরে পুবের আকাশ স্বচ্ছ হল। অমিতা ঠাকুর খাটের পাশে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে একটু করে জল দিচ্ছেন, আর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কবির প্রতিদীনের ধ্যানের মন্ত্র, শান্তম শিবম অদ্বৈতম উচ্চারণ করছেন। বেলা সাতটার সময় রামানন্দ শাস্ত্রী পায়ের কাছে বসে পিতা নোহসি মন্ত্র পাঠ করলেন। বাইরের বারান্দায় মৃদু কণ্ঠে কে যেন গাইছেন, কে যায় অমৃতধাম যাত্রী ... কবির পায়ে হাত রেখে নিঃশব্দে মনে মনে বলে চলেছেন প্রতিমা ঠাকুর, রানী মহালনবিশ – “তমসো মা জ্যোতির্গময় / মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়” – অন্ধকার থেকে এতদিন যাঁর হাত ধরে আলোয় পার হতেন সকলে, তিনি চলে যাচ্ছেন অমৃতলোকের উদ্দেশ্যে।

সকাল ন’টায় অক্সিজেন দেওয়া শুরু হল। ক্ষীণ নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। দ্বিপ্রহর বেলা বারোটা দশ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস পড়ল মৃত্যুহীন প্রাণের। ঘর লোকে লোকারণ্য – আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, অজানা, অনাহূত ভিড় উপচে পড়ছে । একটু পরে সেবক-সেবিকা ছাড়া সকলকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করা হল – গুরুদেবকে স্নান করিয়ে সাজানো হবে। যখন স্নান করানো হচ্ছে, একদল জনতা ওপরে এসে টান মেরে ছিটকিনি খুলে ঘরে ঢুকে পড়ল। স্পর্শকাতর, অসীম অনুভূতিপ্রবণ কবির কি নিদারুণ অপমান - তাঁর প্রাণহীন, অসহায় দেহ একদল কৌতূহলী জনতার চোখের সামনে প্রদর্শনীর মত পড়ে রইল। তাড়াতাড়ি তাঁকে ঢাকা দিয়ে সকলকে কোনোমতে বের করা হল। এক এক দরজায় এক এক জন পাহারায় রইলেন – দরজায় ছিটকিনি সত্ত্বেও বাইরে থেকে প্রবল ধাক্কা। একটু আগের তীব্র শোকের অভিঘাতের চেয়ে সেই মুহূর্তে আতঙ্ক বড় হয়ে গেল সবার জন্য।

গুরুদেবকে সাজানো হল বেনারসী জোড়ে। কোঁচানো শুভ্র ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, উত্তরীয়। ললাটে চন্দন, গলায় গোড়ের মালা, দু পাশে রাশি রাশি রজনীগন্ধা, বুকের ওপর জোড় করা হাতে একটি পদ্মকোরক।

বাইরে তখন উন্মত্ত জনতার কলরব। জানলা দরজার ওপর ক্রমাগত প্রবল করাঘাত পড়ছে। রানী মহালনবিশের মনে পড়ল, কবি বহুবার তাঁদের কাছে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন, “তুমি যদি আমার সত্যি বন্ধু হও তাহলে দেখো যেন কলকাতার উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে, “জয় বিশ্বকবি কি জয়, জয় রবীন্দ্রনাথের জয়” – এইসব জয়ধ্বনির মধ্যে যেন আমার সমাপ্তি না ঘটে। আমি যেতে চাই শান্তিনিকেতনের উদার মাঠ, উন্মুক্ত আকাশের তলায়, আমার ছেলেমেয়েদের মাঝখানে – সেখানে জয়ধ্বনি থাকবে না, অভব্য উন্মত্ততা থাকবে না, থাকবে শান্ত স্তব্ধ প্রকৃতির সমাবেশ। চিরকাল জপ করেছি ‘শান্তম’ – বিদায় নেবার সময় যেন সে শান্তম মন্ত্রই সার্থক হয়। তোমাকে বলে রাখলুম সব আগে থেকে।” পীড়িতচিত্তে সেদিন এবং বাকি জীবন কবির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন তাঁর কাছের মানুষেরা, কবির শেষ ইচ্ছাপূরণ তাঁদের সাধ্যের বাইরে ছিল ভক্ত জনতার নারকীয় উল্লাসে।

বেলা তিনটে বাজতে এক বিরাট জনতার ঢল ঘরে ঢুকে কবিকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। জনসমুদ্রের ওপর দিয়ে যেন একখানা ফুলের নৌকা নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেল। নিমতলা শ্মশানের পথ লোকে লোকারণ্য, বন্যা স্রোতের মত সবাই ছুটছে কোনভাবে একবার শবদেহের কাছে যাওয়ার জন্য। সমস্ত আকাশ সেদিন কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল শ্রাবণের ধারায়, সেই অশ্রুতে ভিজেছিল অগণিত মানুষ। মানুষের ভিড় ঠেলে শবদেহ নিয়ে শ্মশানে ঢোকাই অসম্ভব। উন্মাদ মানুষের হাত থেকে কবির প্রাণহীন দেহ রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে পড়ছিল। খবর গেল লালবাজারে – গোরা সার্জেন্ট এসে লাঠিপেটা করে জনতাকে কিছুটা আয়ত্তে আনলো, শবদেহ নিয়ে আসা হল দাহ করার জায়গায়। মুখাগ্নি করার জন্য রথীন্দ্রনাথ যেতে চান, কিন্তু সাধ্য কী তাঁর সেই ভয়ঙ্কর ভিড় ঠেলে শবদেহের কাছে পৌছন। পুলিশের চোঙায় বারবার অনুরোধ করা হল, "উনি রবীন্দ্রনাথের পুত্র, ওনাকে পথ ছেড়ে দিন নাহলে ছিটে আগুন দিতে বিলম্ব হবে।" কে কার কথা শোনে, প্রবল জনসমুদ্রের গর্জনে কোথায় মিলিয়ে গেছে সে অনুরোধ – প্রণাম, ভক্তি জানানোর এক বীভৎস প্রক্রিয়ায় মেতে উঠেছিল সেদিন কলকাতা। রথীন্দ্রনাথের শ্মশানে ঢোকা তো হলই না, অসুস্থ বোধ করলেও বাড়ি ফেরাও তখন দুষ্কর ।

ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথের পুত্র, কবির দৌহিত্র সুবীর কোনোমতে নিমতলার পাশের সীমানা দিয়ে গঙ্গায় নেমে, তারপর অন্যদিকের পাঁচিল পেরিয়ে শ্মশানে টপকে ঢুকে দাদামশায়ের মুখাগ্নি করলেন। প্রবল বৃষ্টিতে চিতা সাজানো তখন দুস্কর। জনতা তখন উন্মাদপ্রায় – শবদেহ ছোঁওয়ার জন্য, চিতাভস্ম নেওয়ার জন্য (দাহের আগেই), এমনকি মহাত্মার শরীরের অংশ – চুল, দাড়ি, নখ সংগ্রহ করার জন্য জনতার হাত থেকে কোনোমতে দেহ রক্ষা করছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ইত্যাদিরা। শেষ অবধি চিতায় আগুন জ্বলল, ভস্ম হল মহামানবের নশ্বর দেহ। জয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জয় প্রবল ধ্বনি ছাপিয়ে হয়ত তখন দেবলোকে উচ্চারিত হচ্ছিল –

কে যায় অমৃতধামযাত্রী।
আজি এ গহন তিমিররাত্রি,
কাঁপে নভ জয়গানে ।।
আনন্দরব শ্রবণে লাগে, সুপ্ত হৃদয় চমকি জাগে,
চাহি দেখে পথপানে ।।

মূল তথ্যসূত্র :

১. গুরুদেব : রানী চন্দ

২. নির্বাণ : প্রতিমা দেবী

৩. ২২শে শ্রাবণ : নির্মল কুমারী মহালনবিশ

৪. ২২শে শ্রাবণ : সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

সঞ্জয় ব্যানার্জী – জন্ম, বেড়ে ওঠা উত্তর কলকাতায়, পড়াশোনা হিন্দু স্কুল এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। নানা ঘাটের জল খেয়ে, গত দু'দশকের ওপর নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড শহরের বাসিন্দা। আদ্যন্ত অবৈষয়িক, কোনো কিছুতেই বিশেষ স্বাক্ষরহীন মানুষটির প্রিয়, একান্ত সময়যাপনের উপাদান প্রিয় সাহিত্য, গান, নাটক আস্বাদন। আর নিঃশর্ত সমর্পণ, আশ্রয়ের জায়গা রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতায়। গোপনে, নিজের অপারগতায় কবিতা লেখা ছাড়া কখনো সখনো লিখেছেন এক আধটা প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা।

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙালির বিশ্বপরিচয়

পরিণত বয়সে এসে তিনি লিখেছিলেন এক অসামান্য বই – বিশ্বপরিচয়। বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা যে কত সুস্বাদু, কত আকর্ষণীয় হতে পারে, এই বই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

মাঝে মাঝে স্তব্ধ হয়ে ভাবি, এই মানুষটি কী করেননি ? বিশ্বভারতী গড়েছেন, শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতনকে সাজিয়েছেন, নতুন দর্শনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন, সারা পৃথিবী থেকে শিক্ষকদের নিয়ে এসেছেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের জন্য শান্তিনিকেতনে নতুন মেলা বা উৎসবের প্রবর্তন করেছেন। আবার বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিতে শারীরিক কষ্ট অগ্রাহ্য করে নতুনকে জানার অপরিসীম আগ্রহে জাহাজে দীর্ঘ সময় ভেসে পৌঁছে গেছেন পৃথিবীর অন্য প্রান্তে।

আর যদি তাঁর সৃষ্টির কথা ভাবি, সারা জীবনে উনি যা লিখে গেছেন, তার কতটুকুই বা পড়ে ওঠা গেছে! তিনি না থাকলে বাঙালি জাতিকে কি সারা দুনিয়া আদৌ চিনত ! তাঁর লেখার প্রতি অপ্রতিরোধ্য টানে, তাঁকে শাসকদের নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে ওপার বাংলা গর্জে উঠেছিল, ধর্মভিত্তিক দেশ পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে বাঙালি হিন্দু মুসলমান একসাথে সামিল হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে, জন্ম নিয়েছিল বাঙালি জাতির বাংলাদেশ।

একদিন আড্ডার মাঝে সুনীলদা (গঙ্গোপাধ্যায়) হাসতে হাসতে বলেছিলেন, “জানো, এখন ভাবলে হাসি পায়, একসময় আমরা রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করেছিলাম। আমাদের আগে করেছিলেন কল্লোল যুগের কবি লেখকরা। এখন যত বয়স হচ্ছে, তত মনে হচ্ছে তিনি যেন এক মহাসমুদ্র। অনেকে আমায় জিগ্যেস করেন, আপনার কোন লেখাটা থেকে যাবে বলে মনে হয় ? আমি বলি, যদি আমি রবি ঠাকুরের মতো গান লিখতে পারতাম, তাহলে হয়তো নিশ্চিত হতে পারতাম। আর কিছু থাকুক না থাকুক, রবীন্দ্র সঙ্গীত অন্তত পাঁচশো বছর থেকে যাবে।”

এ এক অমোঘ সত্য। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে রবীন্দ্র সঙ্গীতের চুম্বক আকর্ষণে মগ্ন হয়ে আছে বাঙালি। হয়তো গায়কী বদলেছে, নতুন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু মূল সুর, মূল ভাব একটুও বদলায়নি। এখনও ঊষার আলো ফোটার সময় থেকে ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার গভীর রাত্রি পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তের অনুভূতি ধরা আছে তাঁর গানে। সে ঋতু থেকে পূজা – প্রার্থনা, প্রেম থেকে বিরহ, স্বদেশ থেকে বিশ্বচেতনা ... সর্বত্র ব্যাপ্ত তাঁর গান।

সুনীলদার মতোই সমরেশদা (মজুমদার) একদিন বলছিলেন, “ধূর, ওই বুড়ো যা লিখে গেছে, তারপর আমরা একলাইন না লিখলেও বাংলা সাহিত্যের কিছু যেত আসত না। আমি একটা সিরিজ লিখছি, তাকে খানিকটা স্বীকারোক্তিও বলতে পার, নাম দিয়েছি গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি। কেন জান ?”

আমি কিছু বলার আগেই দাদা বললেন, “মানুষ কোর্টে বা শপথ নেওয়ার সময় গীতা বা কোরান বা বাইবেল ছুঁয়ে বলে, যাহা বলিব সত্য বলিব। আমি তো নাস্তিক মানুষ, আমার ধর্মগ্রন্থ একটাই – গীতবিতান।”

সুনীলদা, সমরেশদার কথার সত্যতা নিজের চোখে দেখেছি বারবার। দেখেছি, তাঁর চেয়ে বড় বিশ্বপরিচয় বঙ্গ-সন্তানের কাছে আজও আর কেউ নেই।

নিউইয়র্কের কুইন্স অঞ্চলে শ্যামার বাড়ি। পুরো নাম শ্যামা হক। সে অস্বীকার করে তার ধর্ম, লেখে শ্যামা শ্যামলিপি। সে একাই থাকে বহুকাল। কেন, সে অন্য কাহিনি। তার বাড়িতে কোথাও মন্দির মসজিদ বা মক্কার ছবি

নেই। একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত শুধু রবীন্দ্রনাথের নানা বয়েসের ছবি। তার বাড়িতে দিনরাত শুধু বাজে তাঁরই গান, দেবব্রত থেকে কাদেরি কিবরিয়া, সুচিত্রা থেকে বন্যা।

প্রথম ওর বাড়ি ঢুকে আমরা তো হতবাক। না বলে পারি না, "তুমি তো দেখছি পুরো পাগল। সারাদিন শুধু ওনার গান! আর কোনো গান শোনো না ?"

"না কাকা। তাঁর গান শুনলে মনে হয়, তিনিই আমার আল্লা, তিনিই আমার ভগবান। মাঝে মাঝে যখন অবসাদে ডুবে যাই, তিনি চুপ করে এসে দাঁড়ান আমার পাশে, কানে কানে গেয়ে ওঠেন, শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে ... কখনো গান, ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু, কখনো আবার বলেন, এই করেছ ভালো নিঠুর হে ...! জানো কাকা, একবার আমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছিলাম।"

"দেখেছিলে ? কী বলো ?"

"হ্যাঁ গো কাকা, আল্লার কীরে, দেখেছি। স্পষ্ট দেখেছি। সেবার আমি মরেই যাচ্ছিলাম। তিনি দেখা দিয়ে আমায় বাঁচিয়ে গেছিলেন।"

হাঁ করে শ্যামার মুখের দিকে চেয়ে আছি।

শ্যামা বলে চলে, "ক্রিসমাসের কয়েকদিন আগে, বছর কয়েক আগের কথা। সেবার হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা কুচি কুচি বরফ পড়েছে। এই যে সামনের রাস্তা, তারপর ওই গোরস্থান, সব সাদা বরফে ঢেকে গেল। ছেলেও সেবার ছুটিতে বাড়ি ফিরছে না। একেবারে একা বসে আছি। কোথাও কোনও লোকজন নাই, রাস্তার আলোও যেন মরা- মরা। আমার মন একটু একটু করে বিষণ্নতায় ডুবে যাচ্ছে, কিচ্ছু ভালো লাগছে না ... । আমি কি আর বাঁচব না ? আমার কি কেউ নাই ? ছেলেকে কল দিলাম, সে ধরল না। আমার মনে হল, এই দুনিয়ায় আমার কোনও দরকার নাই ... আমি এক ব্যর্থ মানুষ! এই জীবনের বোঝা আর বইব না, উঠে দাঁড়ালাম, ড্রয়ারে অনেক স্লিপিং পিল আছে ... ঠিক সেইসময় উনি দেখা দিলেন।

"আমি স্পষ্ট দেখলাম, বিরাট আলখাল্লা পরা এক লম্বা মানুষ, বরফের কুচি লেগে আছে যাঁর চুলে দাড়িতে ... আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালেন ওই গোরস্থানের পাশ দিয়ে। আমার শরীরে কাঁটা দিল কাকা, ইনি তো আর কেউ না, আমার প্রাণের ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। দূর থেকে হাত নাড়লেন আমার দিকে, আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম, উনি গাইছেন, আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে ... তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে ... ।

"পাগলের মতো সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলাম, দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম ... নাহ, কেউ নেই। তিনি চলে গেছেন। ততক্ষণে আমার সব কষ্ট ব্যথা দূর হয়ে গেছে, আমিও গাইছি, তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা, বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে ... ।"

আমাদেরও শরীর রোমাঞ্চিত। স্তব্ধ হয়ে দেখলাম, শ্যামার চক্ষু দিয়ে ঝরে পড়েছে অবিরল অশ্রু।

আর একবারের ঘটনা। আমরা কয়েকজন ফিরছি সুইজারল্যান্ডের ওয়েলিংটন থেকে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরাগী এক পরিবারে সারাদিন আড্ডা দিয়ে, রাতের পানভোজন সেরে।

জুরিখগামী ট্রেনে উঠেছি তিন বন্ধু। তখন রাত প্রায় দশটা। গোটা ট্রেন ফাঁকা, আমাদের আশেপাশের কোনও ক্যুপেতে একজনও যাত্রী নেই।

আমাদের এক বন্ধু, হয়তো জলেরই প্রভাবে, উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠল, "পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় ... ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায় ..." আমরাও গেয়ে উঠেছি, আয় আর একটি বার আয় রে সখা, প্রাণের মাঝে আয় ... ।

হঠাৎ দেখি, চলন্ত ট্রেনের ভেস্টিবিউল দিয়ে দুলতে দুলতে একটি অচেনা যুবক এগিয়ে আসছে ! সে গাইছে, "... মোরা ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি, দুলেছি দোলায় ... বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায় ... ।"

গান শেষ হল । ছেলেটাকে দেখেই বোঝা যায়, সে বেদম পরিশ্রান্ত, তার চোখদুটো জবাফুলের মতো টকটকে লাল । তবু সে একগাল হাসল, "দাদা, আপনেরা কলকাতার, তাই না ?"

"হ্যাঁ, আপনি ?"

"আমি দাদা, বাংলাদেশী । সকাল সাতটা থেকে ডিউটি চালু, এই রাতে বাসা ফিরতাছি । এমন একখান গান গাইলেন আপনেরা, অনেক দূরের বগি থেকে তার টানে ছুটে আসলাম ... । হেই যে, রবি ঠাকুর, উনি আছেন বইলাই আমরা আত্মীয় ছাড়া পরদেশে বাইচা আছি । যখন মন খারাপ হয়, আব্বা আম্মু দোস্তোদের জন্য মন কেমন করে, কিচ্ছু ভালো লাগে না, তখন ফোনে উনার গান চালায়ে দেই, সব ক্লান্তি দূর হইয়া যায় ... জানেন দাদা, এদেশে যেমন টাকা আছে, তেমনি খাটনি ।"

"কী কাজ করেন আপনি ?"

ছেলেটা সঙ্কুচিত গলায় বলল, "দাদা, সকালে কাম করি গেঞ্জির কারখানায়, বৈকালে বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে । এখানে খরচ তো খুব । দ্যাশে টাকা পাঠাইতে হয় ... আব্বা, আম্মু, ভাইবুনেরা আছে ... ।" বলতে বলতে ফের সে নিজেই গেয়ে উঠল, "বড়ো আশা করে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও ... ফিরায়ো না জননী ... দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো ... ।"

ছেলেটা গেয়ে চলল চোখ বুঁজে । আমরা বাক্যহারা হয়ে বসে রইলাম । ... আমাদের স্টেশন এসে গেল, নেমে পড়লাম । ছেলেটা তখনও গেয়ে চলেছে, "ওই যে হেরি তমসঘনঘোরা গহন রজনী ... বড় আশা করে ... ।"

আমরা হাঁটছি । বুকের মধ্যে অন্য কেউ গাইছে, "প্রভু আমার, প্রিয় আমার পরম ধন হে ... চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে ... ।"

ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় – সাহিত্যিক ও গদ্যকার । বিদ্যাসাগর পুরস্কার সহ বহু সম্মানে ভূষিত । "কিশোর ভারতী" পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার । পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স গিল্ড, কলকাতার অন্যতম পরিচালক । দেশে বিদেশে বহু জাগায় সাহিত্যের কর্মশালায় আমন্ত্রিত ।

দীপেশ চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ : একটি গান জীবনে ও যাপনে

ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায় একসময় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছিলেন, "an artist in life". ব্যক্তিগত জীবন কাটাতে গিয়ে আমার অনেক সময় মনে হয়েছে, "ইন" কথাটা বদলে "অফ"-ও হয়তো লেখা যেত। তিনি জীবনেও শিল্পী, জীবনেরও শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান বারবার শুনতে বা গাইতে গিয়ে মনে হয়, গান যেন তাঁর জীবনচর্যার অঙ্গ। নিজের দৈনন্দিন জীবনটাই যেন একটা প্রস্তরখণ্ড এবং ছেনি আর হাতুড়ি নিয়ে ঠুকে ঠুকে তাকে একটা ঈপ্সিত আকার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যে মানুষটির হয়তো অন্যান্য বাঙালির চেয়ে অহংকারে অনেক বেশি অধিকার ছিল, যাঁর মধ্যে অহংকার দেখলে আমরা সে অহংকারকে হয়তো ন্যায্য বলে মেনেও নিতাম, তিনি কেন কাতর হয়ে প্রার্থনা করতেন, "সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে"? ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকোর একটি অতি পরিচিত কথা মনে পড়ে, কেয়ার অব দ্য সেলফ। ফুকো সেখানে বলছেন, "উই হ্যাভ টু ক্রিয়েট আওয়ারসেলভ অ্যাজ আ ওয়ার্ক অব আর্ট"। আমাদের জীবনটাকেও শিল্পবস্তু করে তুলতে হয়।

নিজেকে নিয়ে কী করব ? যতই বয়স হয়, জীবনের প্রান্তদেশে এসে পৌঁছাই, তত নিজের মধ্যে, অন্যের মধ্যে ঔদার্য ও কারুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষী ক্ষুদ্রতা ও খর্বতারও সন্ধান পাই প্রতিদিন। তখন ভাবি জীবনের শেষে যে ছোট্ট ডিঙি নৌকা আমার মতো নগণ্য মানুষের কাছে আসবে – সোনার তরীর প্রশ্ন তো আর ওঠে না – তাতে করে আমার সামান্য জীবনের আহরণের কী তুলে নিয়ে যাবে সেই ডিঙি নৌকার মাঝি ? যে মানুষী প্রবৃত্তিতে প্রায় – স্বাভাবিকভাবে প্রতিদিন ক্ষুদ্রতার ও খর্বতার হলাহল উঠে আসে, সেই বিষ রাখার জায়গা তো ওই ছোট নৌকাটিতে নেই !

এই প্রশ্নের বিচার করতে গিয়ে সেই রবীন্দ্রনাথেরই শরণাপন্ন হতে হয়। কারণ তিনি শুধু কবি নন। শুধু কর্মীও নন। বরং অনেক সময়েই মনে হয়, প্রার্থনা ও পূজা পর্যায়ের অনেক গানে "তুমি", এই অন্তরঙ্গে সম্বোধনে "ঈশ্বর" বা "অসীম"-এর সঙ্গে যে একাধারে প্রকাশ্য অথচ একান্ত ব্যক্তিগত কথোপকথন সকলের হয়ে, সকলের জন্য তিনি করেন, তাতে যেন আমাদের এই মানুষী ও সাংসারিক জীবন কীভাবে যাপন করতে হবে তারই নানান ইঙ্গিত রেখে যান রবীন্দ্রনাথ। এখানে আমি তাঁর যে গানগুলো মন্ত্রের মতো "বিপদে মোরে রক্ষা করো", "সংকোচের বিহ্বলতা" অথবা "একলা চলো রে" তার কথা বলছি না। মন্ত্র ম্যাজিকের মতো কাজ করে। সেই "মধুসূদন দাদা"র কথা বা "জয়মণি স্থির হও"-এর মতো শব্দবন্ধ মনে করিয়ে দেয়। সেগুলো তো আছেই, এবং সেখানে সাহসের প্রশ্ন আছে অবশ্যই, কিন্তু সেখানে যাপনের প্রশ্ন নেই। বিপদে পড়লে কারও শরণ নেওয়া একটা আপৎ-ধর্মের মতো। আমি বলছি রবীন্দ্রনাথের

সেই সব গানের কথা যা আমাদের প্রতিনিয়ত নিজের স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতার সঙ্গে লড়াই করতে সাহায্য করে। এমনি একটি গান আজ কিছুদিন হলো আমাকে পেয়ে বসেছে।

গানটি হলো, "আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে"। প্রভাতকুমার জানাচ্ছেন ১৯১৩ সালে লেখা গান, ব্রাহ্মসমাজে গীতও হয়েছে, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মাস খানেক আগের রচনা হয়তো। গানটির "তুমি" কে? রবীন্দ্রনাথের কাছে নিশ্চয়ই ঈশ্বর। গানটি কীভাবে আমার মতো একজন নিরীশ্বরবাদী বা অন্তত অজ্ঞেয়বাদীকে পেয়ে বসল, সেটাই একটু বলি। প্রথমত, ঈশ্বর বা ধর্ম সম্বন্ধে আমার মতামত যাই হোক, আমি হিন্দুধর্মের অনুষঙ্গে বড় হয়েছি। নামগান, নামসংকীর্তন ইত্যাদির সঙ্গে আমি ছোটবেলা থেকেই পরিচিত। নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমার একটা বোধ আছে। তাছাড়া আমি এটাও মনে করি যে – ঈশ্বর, ভগবান, ঠাকুর ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন মনোভাব যাই হোক না, ধর্মের নানা আচার-ব্যবহারের সঙ্গে – যদি আমরা তারই মধ্যে বড় হয়ে থাকি – আমার মতো মানুষের একটি অচেতন বা অভ্যাসগত সম্পর্ক থাকে।

ধর্মানুভূতি আমার অজানা কিছু নয় এবং তার বিরুদ্ধে আমার মনে কোনো বাধা বা প্রতিরোধ গড়ে তোলা নেই। আর নামগান নিয়ে রবীন্দ্রনাথও গান লিখেছেন। খুব বিখ্যাত সেই অন্য গানটি, "তোমারি নাম বলবো, বলবো নানা ছলে" ইত্যাদি। এখানে "নামের নেশা" কেমন বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "শিশু যেমন মাকে/নামের নেশায় ডাকে/বলতে পারে সেই খুশিতে মায়ের নাম সে বলে"। নামের নেশা আমি জানি। প্রেমে যিনি পড়েছেন, তিনিই জানেন। কাজেই রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর সম্বোধনে আমার কোনো অসুবিধা হয় না। ঈশ্বর বলতে আমি ধরে নিই যে আমার প্রাত্যহিকের মানুষী সংসারে লিপ্ত ক্ষত-বিক্ষত ক্ষুদ্র "আমি"র চেয়ে অনেক বড়, রবীন্দ্রনাথ যাকে অন্যত্র "অসীম" বলেছেন, তেমন কিছু। এই সকল-বহা, সকল-সহা পৃথিবীর মতো, যাকে না হলে আমার চলে না, কিন্তু আমাকে ছাড়া যার দিব্যি চলে যায়।

গানটিতে এই অসীমকে আমাদের সীমিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, সব কাজেকর্মে, ঘুমে, জাগরণে নিবিড় করে পাওয়ার প্রার্থনা আছে। কথায়, নীরবতায়, প্রায় প্রেমানুভূতিতে রক্তধারার ছন্দে, দেহবীণার তারে, নিদ্রায়-জাগরণে, আকাঙ্ক্ষা-আশায়, কাজে-ভালোবাসায়, যেন সেই দয়িতের নাম কীর্তিত হয়। গানটির কয়েকটি লাইন আমার বিশেষ প্রিয়। কবি চান যে সেই কাঙ্ক্ষিত অসীমের দেবতা যেন গানটির "আমি"কে মমতায় ঘুমে-জাগরণে রক্ষা করেন : "ঘুমের" পরে জেগে থাকুক নামের তারা তব/জাগরণের ভালে আঁকুক অরুণলেখা নব"। প্রেমের ভেতরে বহমান বাৎসল্য রস। আমাকে খুব আবিষ্ট করে তার পরের দুটি লাইনও। "সব আকাঙ্ক্ষা-আশায় তোমার নামটি জ্বলুক শিখা"। আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়েই আমাদের জাগতিক, সাংসারিক জীবন গড়া; কিন্তু তার মধ্যেও যেন সেই অসীমের নাম একটি শিখার মতো জ্বলে। পড়লেই আমার মনে হয়, এই শিখা তো শুধু জ্বলছে না, যা কিছু মলিনতার আবর্জনা – তাকে পুড়িয়ে ফেলছে, আবার যেন একই সঙ্গে দীপ হয়ে পথও দেখাচ্ছে। এ কথা বলেই কবি ফিরে আসেন নিজের ভালোবাসার প্রশ্নে। আমাদের ভালোবাসা সচরাচর সাংসারিক হয়ে স্বার্থের সঙ্গে, সম্পত্তির সঙ্গে, ছেলেপুলের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ উল্টোটা চাইছেন "সকল ভালোবাসায় তোমার নামটি রহুক লিখা"। অর্থাৎ, আমার সব ভালোবাসায়ও যেন সেই অসীমের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়।

গানটি শেষ হয় মৃত্যুর সীমানায় এসে। জীবন ভরে এই নামের মধু সঞ্চয়ন করে মৃত্যুর সময় সেই দানই যেন সারা জীবনের সঞ্চয় বলে দাতাকে ফিরিয়ে দিতে চান কবি :

"জীবনপদ্মে সংগোপনে রবে নামের মধু
তোমায় দিব মরণ-ক্ষণে তোমারি নাম বঁধু"।

এখানে মৃত্যুও প্রেমঘন। লাইনগুলো যেন আমাকে বলে, যখন আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের জন্য রাখা সেই ডিঙি নৌকাখানি আসবে, তখন যেন সেই অসীমের – কথা - বলে এমন কোনো সঞ্চয় আমার এই সামান্য জীবনে হয়ে থাকে। গানটির শেষে এসে এমন একটি প্রার্থনাই আমার ভেতর বেজে ওঠে। "বেজে ওঠে" বললে ভুল হয়, রবীন্দ্রনাথ বাজিয়ে তোলেন।

গানটায় "প্রেম" যে মিশ্র রসে তৈরি সে কথা বার বার বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রেমের বাখানে অনেক সময়েই – হয়তো সব সময়েই – গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বে মজে ভাবতেন। এবং প্রেমের মধ্যে যে মৃত্যু তা মধুর রসে জারিত বলে মনে করতেন। যেমন "মধুর তোমার শেষ যে না পাই" গানটা। জীবনের শেষ আছে, কিন্তু প্রেম মিশে যায় যে মধুরে, সেই মধুরের শেষ নেই। আবার অন্যত্র লিখছেন, "ধরণীর মাঝে কয়েকটি সুর/রেখে দিয়ে যাবো করিয়া মধুর/তারপর ছুটি নিব"। এখানেও সেই মধুরে শেষ। (আমাদের খাওয়ার মধ্যে এই রসতত্ত্ব মিশে আছে, যে কারণে আমরা মধুরেণ সমাপয়েৎ বলি)। এমনকি সেই যে লাইন, "বঁধুরে যেদিন পাবো, ডাকিব মহুয়া নাম ধরে", সেখানেও সেই মহুয়ার উল্লেখে মধুর রসের আভাস।

আমি বলব, জীবনপদ্মের সঞ্চয় যদি নামের মধুটুকুই হয় – এখানে কার্যত "নাম" আর "নামের মধু" এক মনে হয় – তখন দেবার সময় তাঁর কাছ থেকে যা আমি পেয়েছি – নামের মধু (= নাম, এ ক্ষেত্রে) – সেটাই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব। মনে রাখতে হবে, আমি আমার দয়িতের সৃষ্টি। দয়িত আমার বঁধু ঠিকই, কিন্তু এখানে আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। আমার মতো করে ভাবলে কথাটা খানিকটা "সোনার তরী"র সঙ্গে মিলে যায় : আমার জীবন সঞ্চয়ের সেটুকুই তরীতে উঠবে, যেটুকু সোনার ধান – "আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি"। এ ক্ষেত্রে যেটা "আমার" জীবনে ফলানো সোনার ধান, সেটা আমার/কবির জীবনে সঞ্চিত "নামের মধু", অর্থাৎ তাঁরই মধুময় উপস্থিতির প্রকাশ।

দীপেশ চক্রবর্তী – প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ। উত্তর উপনিবেশবাদ এবং সাবল্টার্ন থিওরি নিয়ে তাঁর কাজের জন্য তিনি বিশ্বের কাছে পরিচিতি লাভ করেছেন। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন।

সৌমিক বসু

গানের ওপারে

আবার একটি পঁচিশে বৈশাখ এসে গেলো। পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে সমগ্র বাঙালি জাতিরও যেন জন্মদিন। বাঙালি জাতি রবীন্দ্রনাথ দ্বারা একপ্রকার সম্মোহিত, দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক নেতারা তাঁর কবিতা, গান এর বুলি মুখে আওড়ান, "রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ...." বলে তিনি যা বলে গেছেন তা বলেন এবং কখনো কখনো যা বলেননি, সেরকম কথাও তিনি বলেছেন বলে চালিয়ে দেন। আমাদের নিজেদের সংস্কৃতিমনস্ক প্রমাণ করার জন্যে আমাদের অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের নাম নিতে হয়।

কোনো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির আড্ডায় উপস্থিত থেকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি, উত্তর মিলবে হয় "রবীন্দ্রনাথই আমাদের জীবন, ওঁকে নিয়েই তো বেঁচে আছি।" অথবা "আমি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধি করি", নিদেনপক্ষে "তিনি আমার প্রাণের ঠাকুর" এরকম কিছু বলতে শোনা যাবে। আবার বহু স্বঘোষিত রবীন্দ্রপ্রেমীকে প্রিয় কবিতার নাম বলতে "শেষের কবিতা" বলতে শুনেছি। আরো আছে। প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখ বা বাইশে শ্রাবণ নেট নাগরিকদের একাংশ ফেসবুকে প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত হিসাবে পোস্ট দিয়ে চলেছেন "আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে", "আমি বাংলায় গান গাই", "দেখো আলোয় আলোয় আকাশ", ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্বত্র আধাশিক্ষা আর অশিক্ষার জয়গান।

নিজেদের সংস্কৃতিমনস্ক প্রমাণ করার কিছু স্টেটাস সিম্বল হিসাবে না দেখে কবে যে বাঙালি তাঁকে, মানুষ রবীন্দ্রনাথকে অন্তর থেকে গ্রহণ করবে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্পর্কে কি ভেবেছিলেন, স্বাদেশিকতা বিষয়ে কি বলে গেছেন, নারীমুক্তি সম্পর্কে কি ভেবেছিলেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে কি লিখে গেছেন, বিজ্ঞান সম্পর্কে কি ভেবেছিলেন সেই নিয়ে পড়াশুনা করলে এবং তা পালন করার চেষ্টা করলে খুশি হবো।

যাই হোক, আজ কথা বলবো রবীন্দ্রনাথের গান ও তাঁর প্রভাব নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ প্রায় দুই হাজারেরও বেশি গান রচনা করেছিলেন এবং বহু গানে তিনি নিজেই সুরারোপ করেছিলেন। তাঁর এই গানগুলি কেবল বিনোদন হিসেবেই নয়, শিক্ষা, চেতনা, মূল্যবোধ এমনকি মানসিক প্রশান্তির আকর হিসাবে বাঙালির জীবনে এক বিশেষ ভূমিকা রাখে। রবীন্দ্রনাথ ১২ কি ১৪ বছর বয়সে প্রথম গান রচনা করেন, "গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে" গানটিই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম রচনা। যদিও এটি মূলত একটি ভজনের অবলম্বনে রচিত বলে অনেকে এটিকে রবীন্দ্রসংগীত হিসাবে মানতে চান না। এরপর প্রায় ৭০ বছর ধরে নিয়মিত গান রচনা করেছিলেন তিনি। আর তাঁর জীবনের শেষ গানটি ছিলো তাঁর নিজের জীবনের শেষ জন্মদিন উপলক্ষ্যে লেখা, "হে নূতন, দেখা দিক" গানটি। এই বিশাল গানসম্ভারকে ৬ পর্যায়ে বিভক্ত করেন রবীন্দ্রনাথ। এগুলি হলো "পূজা", "স্বদেশ", "প্রেম", "প্রকৃতি", "বিচিত্র"ও "আনুষ্ঠানিক"। এবার দেখা যাক প্রতিটি পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য এবং কিছু পরিচিত গান।

পূজা পর্যায় : এই গানগুলিতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, আধ্যাত্মিক চিন্তা এবং জীবনের গভীর দার্শনিক ভাবনা প্রকাশ পায়।

১. "আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে"

২. "বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা"

৩. "তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী"

স্বদেশ পর্যায় : এই গানগুলিতে স্বদেশপ্রেম, দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং দেশের জন্য আত্মত্যাগের প্রেরণা দেখা যায়।

১. আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি

২. ও আমার দেশের মাটি

৩. বাংলার মাটি, বাংলার জল

প্রেম পর্যায় : এই গানগুলিতে মানব হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি, প্রেম ও বিরহের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

১. কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া, তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া

২. "তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম"

৩. প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, মরি একি তোর দুস্তরলজ্জা

প্রকৃতি পর্যায় : প্রকৃতির সৌন্দর্য, ঋতু পরিবর্তন এবং প্রকৃতির প্রতি কবির মুগ্ধতা এই গানগুলিতে প্রকাশ পায়।

১. "পৌষ তোদের ডাক"

২. আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে

৩. "ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়"

বিচিত্র পর্যায় : এই পর্যায়ের গানগুলির বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বিচিত্র এবং এগুলি জীবনের নানা দিক, মানুষের বিভিন্ন অনুভূতি ও চিন্তাভাবনাকে তুলে ধরে। বিচিত্র পর্যায়ের গানগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায় দার্শনিক ভাবনা, সামাজিক ও মানবিক প্রেক্ষাপট, বিবিধ অনুভূতি যেমন আনন্দ, বিষাদ, জিজ্ঞাসা, সংশয়, আশা-নিরাশা ইত্যাদি নানা প্রকার মানবীয় অনুভূতি।

১. "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি"

২. যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,

৩. মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে

আনুষ্ঠানিক পর্যায় : সেই গানগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান, সভা, অথবা বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য রচিত ও গীত হতো। এই গানগুলির একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজন থাকত।

১. "মরুবিজয়ের কেতন উড়াও"

২. অগ্নিশিখা এসো এসো

৩. এসো হে গৃহদেবতা,

রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ সৃষ্টিশীল হাতের ছোঁয়ায় রবীন্দ্রসংগীত দেশজ এবং বিশ্ব সঙ্গীতের উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। হিন্দুস্থানী রাগ সংগীত এবং শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বড় হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বিষ্ণুপুর ঘরানার বিখ্যাত পন্ডিত যদুভট্টের ছাত্র ছিলেন। এই ঘরানার আবহে বেড়ে ওঠায় পরবর্তীকালে তাঁর বহু গানে এই ধরনের সুরের প্রভাব দেখা গিয়েছে। অন্যদিকে খেয়াল ও ঠুমরির হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় রূপ ব্যবহার করেও তিনি প্রায় ৩০০টি গান রচনা

করেছেন। আবার বাউল দর্শনের আধ্যাত্মিকতায় রবীন্দ্রনাথ এতটা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি নিজেকে রবীন্দ্র-বাউল বলে সম্বোধন করা শুরু করেন। তাঁর অজস্র গানে বাউল গানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কীর্তনের ভাব ও সুর দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর বেশ কিছু গানে কীর্তন আঙ্গিকের উপাদানগুলিকে মিশিয়ে নতুন ধরনের গান সৃষ্টি করেছিলেন। আবার পাশ্চাত্যের সংগীতের অন্ধ অনুকরণ না করে বিদেশি গানের সুর ও রীতি অবলম্বনে নিজের শেকড়ের উপযোগী করে অজস্র কালজয়ী গান রচনা করে গিয়েছেন তিনি।

বাঙালি জীবনে রবীন্দ্রসংগীতের প্রভাব গভীর এবং বহুমাত্রিক। এই প্রভাব কেবল সঙ্গীত বা শিল্পকলাতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বাঙালির সংস্কৃতি, আবেগ, জীবনযাত্রা এবং জাতিসত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাঁর গানের আসল গুণ হল মর্মস্পর্শী হওয়ার ক্ষমতা। যে গান শুনে কেউ মরণের ওপার থেকেও জেগে উঠতে পারে, যে গান শুনে মৃত্যুপথযাত্রী শান্তি পায়, যে গান আমাদের কলুষিত বিষাক্ত জীবনে নির্মল বাতাসের ছোঁয়া আনে, সে গানের কোনো ব্যাখ্যা দিতে যাওয়া বোধহয় অনর্থক।

আমার প্রজন্মের গড়পড়তা বাঙালি, যার সাথে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ঘটে "আজ আমাদের ছুটি", নয়তো "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে" গানের মাধ্যমে, যার বেড়ে ওঠা তরুণ মজুমদারের ছবি দেখে, যেসব ছবি মানেই সেই সব কালজয়ী রবীন্দ্রসংগীতের ছোঁয়া, তাঁদের কাছে রবীন্দ্রসংগীত শুধু গান নয়, বাঙালির আবেগ, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং জাতিসত্তার প্রতিচ্ছবি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই গান বাঙালির হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবে। আজকাল মেন্টাল হেলথ, মানসিক অবসাদ ইত্যাদি নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। আমি ভাবি কি ভাগ্য আমাদের এক খানা রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর হাজার দুয়েক গান ছিলো, শোকে, দুঃখে, আনন্দে, উৎসবে আমরা তাঁর শরণাপন্ন হতে পারি।

সৌমিক বসু – পেশাগত ভাবে তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, নেশাগত ভাবে পাঠক। কর্মসূত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবাসী জীবন অতিবাহিত করলেও, ফিরে ফিরে গিয়েছেন কলকাতায়, বাংলা ভাষার টানে। ২০১৮ সাল থেকে স্থায়ীভাবে অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বাসিন্দা। পেশাগত ব্যস্ততার মাঝে অবসর সময় অনেকটা কাটে সাহিত্যপাঠ ও সাহিত্য চর্চায়। লেখক হিসাবে বিচরণ মূলত প্রবন্ধ ও রম্যরচনায়।

ভজেন্দ্র বর্মন

নিমন্ত্রণ বিভ্রাট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিমন্ত্রণ শব্দ নিয়ে অনেক কিছু লিখেছেন। তাঁর এক বক্তব্য ছিল "আমাদের দেশে নিমন্ত্রণের সহিত বহুব্যয়সাধ্য আহারের বিশেষ যোগ থাকাতে একটা হানি হইয়াছে। সদাসর্বদা নিমন্ত্রণ করা লোকের পোষায় না। একটা উপলক্ষ্য না হইলে কেহ প্রায় নিমন্ত্রণ করে না"[১]। অতীতে নিমন্ত্রণ দেওয়া ব্যয়বহুল ছিল এবং এখনও তাই। অনেক সময় নিমন্ত্রণ রক্ষা করাটাও বড় শক্ত ব্যাপার হয়। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি উদাহরণ দিয়েছেন, "এখনো আমার স্ত্রী কোথাও নিমন্ত্রণ খাইতে গেলে তাহার গায়ে আমার জমিদারীর অর্ধেক আয় বাঁধিয়া দিতে হয়!"[২]। শুধু দামী পোশাক বা অলংকার নয়, এখন উপহার নিয়ে নিমন্ত্রণে যাওয়াটিও রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাঁরা নিমন্ত্রণ দেন, রবীন্দ্র-কালীন সময়ের মত, তাঁরা নিশ্চয় কিছু না কিছু সমস্যার মধ্যে পড়েন। আর্থিক দিক বিবেচনা করলে অনেক ভাবনা-চিন্তার উদ্রেক হয়। এগুলোর মধ্যে কত জন নিমন্ত্রিত হবে এবং কাকে নিমন্ত্রণ দেওয়া উচিৎ – এ দুটোর সমাধান প্রথমেই প্রয়োজন। তারপর কবে এবং কখন আসতে হবে ঠিক করা হয়। যেহেতু ভোজন ছাড়া নিমন্ত্রণ সম্পন্ন হয় না, কি কি খাওয়ানো যায়, কে কি খায় যথা নিরামিষ না আমিষ, এবং কত ধরনের খাবার থাকবে নির্ধারণ করতে হয়। সমাজে চা পানের নিমন্ত্রণ দেয়া বা নেয়া বিদেশের মাটিতে গণ্য হলেও, আমরা দেশের মত বিদেশেও এটাকে নিমন্ত্রণ বলি না। কারণ সেখানে ভোজন বলতে আমরা যা বুঝি তা থাকে না।

নিমন্ত্রণ করা

বাঙালীরা যে সব উপলক্ষ্য নিয়ে নিমন্ত্রণ দেন তাদের মধ্যে জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, গ্রাজুয়েশন, বিবাহ, বিবাহ বার্ষিকী অন্যতম। এছাড়া অনেক ধর্মানুষ্ঠান ও অন্য কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যেও আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের নিমন্ত্রণ দেয়া হয়।

বিবাহ ক্ষেত্রে কার্ড দিয়ে নিমন্ত্রণ দেয়ার রীতি এখনো চলমান। তবে সবাই তা করতে চান না। অতীতের হাতের লেখা অথবা কার্ড পদ্ধতিতে অর্থ ও সময় খরচ অনেক। এখন বেশীর ভাগ মানুষ অন্তর্জাল মাধ্যমে প্রায় সব ধরনের নিমন্ত্রণ দেন। ফোনে নিমন্ত্রণ দিতে গেলে ঝামেলা থাকে। তার হিসাব রাখতে হয়। যদিও অনেকে ফোন পেলে ধরেন, কাউকে কয়েক বার ফোন করেও পাওয়া যায় না। তখন তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মাধ্যমে জানাতে হয় যে তাঁকে নিমন্ত্রণ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তারপর অনুষ্ঠানের পাঁচ-সাত দিন আগে আবার ফোন করে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়।

কাকে নিমন্ত্রণ দেয়া যায়, এটা নানা ভাবে নির্ধারণ করা হয়। নিকট আত্মীয় তো থাকবেন। ঠিক মত স্মরণ না করতে পারলে তাঁদের কেউ বাদ পড়ে যেতে পারেন। আবার কোন নিকট আত্মীয় বাদ পড়ে যদি তাঁর সাথে বনিবনা না হয়। তখন নিকট আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ দেওয়া তো দূরে থাকুক, দেখতেও ইচ্ছা হয় না। তারপর, বন্ধুরা – ভালো বন্ধু, একটু বন্ধু, কাজের বন্ধু এবং ভালো বন্ধুর বন্ধু, সবাই নিমন্ত্রণ পেতে পারেন।

"পরিবারের সকল" কে নিমন্ত্রণ করা এখন প্রায় উঠে গেছে। জানাজানি থাকা সত্ত্বেও বাড়ির সবাই নিমন্ত্রণ নাও পেতে পারেন। আগের মত "পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ ত্রুটি মার্জনীয়" কেহ আর লেখেন না। অন্তর্জাল মাধ্যমে নিমন্ত্রণ করাতে যে ত্রুটি হতে পারে তাও কেহ স্বীকার করেন না।

কতজন নিমন্ত্রিত হবেন, এটা একটা বড় প্রশ্ন। বড় আকারের অনুষ্ঠান, যেমন বিবাহ এর জন্য নিমন্ত্রণ দেয়া হলে সাধারণত এক শত থেকে এক হাজারের বেশী অতিথি হয়। এ সংখ্যা নিমন্ত্রণকারীর সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। বেশীর

ভাগ ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করা হয়। আমাদের সমাজে কেহ কেহ আত্মীয় স্বজনসহ শহর পল্লী বা গ্রামের গণ্য-মান্য, গরীব-ধনী সবাইকে নিমন্ত্রণ করেন। এখানে অন্য ধর্মের লোকও থাকতে পারেন। তাঁদের জন্য পৃথক পৃথক রান্নার ব্যবস্থা রাখা হয়। সংখ্যায় কতজন অতিথি থাকবেন, এটার উপর নির্ভর করে কত বড় বা ছোট হল ঘর ভাড়া করতে হবে – এটা নিজের বাড়ি বা পার্টি হলও হতে পারে, সামর্থ্য থাকলে রেষ্টুরেন্ট বা হোটেলও হতে পারে।

ঘরোয়া ছোট অনুষ্ঠান নিকটতম বন্ধু ও পরিবারদের নিয়ে করা হয়। এখন এটাই প্রাধান্য পেয়ে আসছে। কারণ হলো, এতে ছেলে-মেয়েরা সহ মা-বাবা, দাদু-দিদিমারা আসেন। বয়স্কদের ও ছেলে-মেয়েদের পৃথকভাবে আড্ডা উপভোগ এবং ভোজন করার সুযোগ থাকে। এই ছোট বলয়টি তাঁদের কাউকে ছেড়ে অন্যত্র যেতে চান না। অনেক সময় নিমন্ত্রণকারীকে বলতে দেখা যায় যে তাঁদের গ্রুপের সবাই আসছেন কিনা। যদি তাঁদের বাড়িতে আত্মীয় স্বজন থাকেন, অনেকে তাঁদেরও নিমন্ত্রণ জানাতে অনুরোধ করেন। যাঁদের বন্ধুর সংখ্যা অনেক বেশী, বাড়িতে ডাকতে গিয়ে তাঁরা একই উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিতদের ভাগ করে একাধিকবার অনুষ্ঠান করে থাকেন।

ইচ্ছা থাকলেও অনেকে তাঁদের সকল বন্ধুদের নিমন্ত্রণ দিতে পারেন না। এ জন্য তাঁদের কোন ত্রুটি হয়েছে বললে ভুল হবে। তবে এটা ঠিক হবে না যদি নিমন্ত্রণকারী কাউকে সবার সামনে মৌখিক ভাবে "নিমন্ত্রণ দিবেন" বলা সত্বেও কার্ড না পাঠান বা নিমন্ত্রণ না করেন, এবং অনুষ্ঠান কখন এবং কোথায় হবে না জানান। এমতাবস্থায়, এ ব্যাপারে অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করলে তাঁর কাছে মিথ্যাচার করা ছাড়া মুখ রক্ষা করার উপায় থাকে না। নিমন্ত্রণ যিনি পান নি, তিনিও ভীষণ বিব্রত বোধ করেন।

একটা বিতর্কিত নিমন্ত্রণ হল যখন দেখি "অনুগ্রহ করে বাচ্চাদের আনবেন না" লেখা থাকে অথবা বলা হয়। এটা বেশীর ভাগ "ধনী" মানুষ করে থাকেন। দেখা যায়, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা সেখানে থাকতে পারে কিন্তু অন্যের ছেলে-মেয়েরা থাকতে পারবে না। এটা কেন ঘটে এবং কোন যুক্তিতে এটা করা হয় বোধগম্য নয়। অনেকে এরকম নিমন্ত্রণ এড়িয়ে যাওয়াটাই সমীচীন মনে করেন।

অনেক সময় নিমন্ত্রণ হীন অতিথিরা, বিশেষ করে গ্রামের নিমন্ত্রণ বাড়িতে, হাজির হতে পারেন। আমাদের সমাজে বহু গরীব লোক আছে বলে এটা হয়। কিছু খেতে পাবেন এই আশায় তাঁরা আসেন। দুর দুর করে তাড়াতে চাইলেও তাঁদের তাড়ানো কঠিন। তাঁদের জন্য অতিরিক্ত খাবার রাখা একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খাবার-দাবার

বাড়ির সাধারণ খাবারের চেয়ে নিমন্ত্রণের খাবার সচরাচর অনেক উন্নত এবং অনেক পদের হয়। প্রথমে জলখাবার, ফল-মূল ও পানীয় থাকে। এতে ভাজি, আমিষ ও নিরামিষ মুখরোচক খাবার দেয়া হয়। নানা ধরনের পানীয় রাখা হয়। তারপর মূল খাবার। সেখানে ভাত, পোলাও, ডাল, সবজি, টক ও রুটি (চাপাতি) সহ আমিষ জাতীয় খাবার মাছ ও মাংস থাকে। এখানে মাছ ও মাংস বহু রকমারি হতে পারে। সব শেষে থাকে মিষ্টি মুখ এবং চা বা কফি। মিষ্টি হিসাবে পায়েস, রসগোল্লা, পিঠা, সন্দেশ, দই, ইত্যাদি থাকতে পারে। এত খাবার থাকে যে দেখলে অবাক হতে হয়। এ খাবারের প্রশংসা অন্তত সপ্তাহ খানেক চলতে থাকে।

অতিথিকে খাওয়ানো খুবই ব্যয়বহুল। প্রায় দেখা যায় ১০ শতাংশ অতিথি আসবেন বলেও আসেন না। উদাহরণ স্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রে হল ঘরে খাওয়ানোর জন্য এখন মাথাপিছু ১০০ থেকে ৩০০ ডলার খরচ হতে পারে। যাঁরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন না, তাঁরা নিমন্ত্রণকারীকে অহেতুক খরচ করান।

উপহার

কিছু উপহার নিয়ে নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়া একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাক্স বা ব্যাগে করে উপহার নেয়া যায় আবার অর্থও দেয়া যেতে পারে। একই জিনিসের উপহার বাক্স সব জায়গায় চলে না। ভাবনা-চিন্তা করে অনুষ্ঠান অনুযায়ী জিনিসপত্র সহ বাক্স-উপহার দিতে হয়। টাকা উপহার প্রায় সর্বত্র দেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সাধারণত অনুষ্ঠান এবং নিমন্ত্রণকারীর সাথে সম্পর্ক অনুযায়ী কম-বেশী টাকা দেয়া হয়। টাকা দিতে গিয়ে খুব অল্প বা খুব বেশী হতে পারে এই অসুবিধায় কয়েকটি সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে। নিজের আয়, সামাজিক নিয়ম, সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ও কি রকম বন্ধুত্ব, বাড়ির কত জন নিমন্ত্রিত, নিমন্ত্রণ স্থান, খাবারের মান, ইত্যাদি বিবেচনা করা প্রয়োজন। সব বিবেচনা করে একটি গ্রহণ যোগ্য সংখ্যা নির্ধারণ করা যেতে পারে। খুব কম টাকা দিলে নিজের কৃপণতা প্রকাশ পায়। খুব বেশী দিলে উদারতা দেখানো হয়। উপহার প্রাপকদের বিচক্ষণ ও নমনীয় চোখে এ ব্যাপারটি দেখা উচিত। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে অল্প আয়ের মানুষ উপহারের জন্য অল্প কিছু দিলে, তা যেন হাসিমুখে গৃহীত হয়। টাকা দেয়ার বিষয়ে নীচের প্রস্তাব শুধু উদাহরণ মাত্র।

- যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতঃ গ্রাজুয়েট দের শ্রেণী ভিত্তিক উপহারের কম-বেশী সীমা নিম্নরূপ হতে পারে। মধ্য বিদ্যালয়-অষ্টম গ্রেড, ১০ থেকে ৩০ ডলার; উচ্চ-বিদ্যালয়-দ্বাদশ গ্রেড, ৩০ থেকে ২০০ ডলার; কলেজ-স্নাতক, ৫০ থেকে ৫০০ ডলার।
- বিবাহ ক্ষেত্রে টাকা উপহার দিতে গেলে টাকার পরিমাণ ৫০ থেকে ১,০০০ ডলার হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, যখন রবীন্দ্রনাথকে পোশাকেই অর্ধেক জমিদারি দিয়ে দিতে হত, আজকের দিনে উপস্থিত থাকলে উপহারে তিনি কত খরচ করতেন তা বোধ হয় সহজেই অনুমেয়।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

নিমন্ত্রণে অতিথি এবং নিমন্ত্রণকারী, দু পক্ষই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। কোন পক্ষ মৌখিক ভাবে অথবা পত্র (কার্ড) মারফত ধন্যবাদ জানালে অপর পক্ষ খুশী হন। কৃতজ্ঞতা জানালে উপহার দাতাদের ভালো লাগবে। অতিথিদের যে কোন প্রশংসা নিমন্ত্রণকারীও পছন্দ করবেন।

সামাজিক ভোজন উপলক্ষ্যে অল্প খরচের নিমন্ত্রণ

নিমন্ত্রণ-সভা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যয়বহুল আহার হওয়াকে সমস্যা হিসাবে দেখেছেন। তিনি আরো লিখেছেন, যদি আহার না থাকতো তাহলে নিমন্ত্রণ সংখ্যা নাকি অনেক বাড়তো যদিও নিরাহার নিমন্ত্রণ আমরা এখনও ভাবতে পারি না।

আনন্দের বিষয় যে এখন আমাদের সামাজিক ভোজনের জন্য শুধুমাত্র নিমন্ত্রণের অপেক্ষায় থাকার দরকার হয় না। আমরা উপহার না কিনে এবং অল্প খরচে সবার সাথে ভোজন করতে পারি। নিজেদের উদ্যোগে কমিটি বা গ্রুপ করে আমরা বারোয়ারী কায়দায় অনুষ্ঠান করতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ, ধর্মানুষ্ঠান বা অন্যান্য অনুষ্ঠান যেমন বনভোজন, এমন ভাবে হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সবাইকে চাঁদা দিয়ে যোগদান করতে হয়। কেহ কেহ উৎসাহ সহকারে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে প্রয়োজনীয় কাজ করেন। এসব অনুষ্ঠানে অনেকের সাথে দেখা করা যায়। সেখানে খাদ্য-সামগ্রীও বেশ উন্নত মানের হয়। এখানে উপহার না আনলেও চলে।

আগে কাউকে নিমন্ত্রণ দিয়ে ঘরোয়া ছোট অনুষ্ঠান করার কথা বলা হয়েছে। এটাও যৌথভাবে খাদ্য-পানীয়-পাত্র এনে পটলাক (Potluck) করে উপভোগ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে যে যা আনবেন তার সমন্বয় করলে সামাজিক ভোজনটি বহু উপাদান সহ হওয়াতে খুবই উপভোগ্য হয়।

ভবিষ্যতে যদি উপরোল্লিখিত স্বল্প খরচে সামাজিক ভোজন করার মত আরো কিছু উপায় উদ্ভাবন হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আমাদের দেশে নিমন্ত্রণের সহিত বহুব্যয়সাধ্য আহারের বিশেষ যোগ থাকা" আরো নিরসন হবে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে নিমন্ত্রণ এবং আমন্ত্রণ

"নিমন্ত্রণ" এর সঙ্গে "আমন্ত্রণ" শব্দটির অর্থ এবং ধ্বনিগত মিল এবং অমিলের কথা কিভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রবন্ধ, উপন্যাস, গান ও কবিতায় ব্যবহার করেছেন তা মূল্যায়ন করা যেতে পারে। আভিধানিক সংজ্ঞায় সামাজিকতার জন্য নিমন্ত্রণ ও আমন্ত্রণ শব্দের অর্থগত পার্থক্য নেই। তবে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। বিষয়টি এইরকম যেমন, কাউকে আমন্ত্রণ জানালে খাবার পরিবেশনে কেহ বাধ্য নন। আপ্যায়নের খাতিরে হয়ত চা-কফি পান করতে দিতে পারেন। কিন্তু, কেউ নিমন্ত্রণ করলে নিমন্ত্রিতরা ধরে নেন যে খাবার পরিবেশন করা হবে। সুতরাং নিমন্ত্রণ বা আহ্বানকারীর পক্ষ থেকে ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থা থাকলে, তাকে নিমন্ত্রণ বলা যায় কিন্তু যেখানে ভোজনের ব্যবস্থা থাকে না বা অল্প স্বল্প জল খাবারের আয়োজন থাকে তাকে আমন্ত্রণ বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের কথায় গুটিকয়েক নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ এবং নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের উদাহরণ দেয়া হল, যা রবীন্দ্র রচনাবলীর বৈদ্যুতিন সংস্করণ থেকে গৃহীত[৩]। যেসব ক্ষেত্রে খাদ্য এবং অন্য কোন উপভোগ্য বস্তু পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাকে নিমন্ত্রণ বলা হয়। আমন্ত্রণের মাধ্যমে, যা খাদ্য নয় এমন একটি সুস্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন লভ্যবস্তু পাওয়ার কথা বোঝানো হয়। নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে লভ্যবস্তু পাওয়া ও না-পাওয়া উভয়ই জড়িত থাকে।

নিমন্ত্রণের উদাহরণঃ

- জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার **নিমন্ত্রণ**। ধন্য হল, ধন্য হল 'মানবজীবন'[৪]।
- যেখানে খবরের কাগজেরও পত্রমর্মর শোনা যায় না এমন একটি সামান্য গ্রামে চাষিরা একদিন আমাকে **নিমন্ত্রণ** করেছিল। সেখানে প্রায় সকলেই মুসলমান। আমার অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে চলছিল একটা গানের পালা। চাঁদোয়ার তলায় কেরোসিন-লণ্ঠন জ্বলছে, মাটির উপর ছেলে বুড়ো সকলেই বসে আছে স্তব্ধ হয়ে। যাত্রাগানের প্রধান বিষয়টা গুরু-শিষ্যের মধ্যে তত্ত্বালোচনা – দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব। থেকে থেকে তারই সঙ্গে নাচ গান কৌতুকের দ্রুতমুখরিত ঝংকার[৫]।
- এক-এক ঋতুতে এক-এক মহল হইতে যখন উৎসবের **নিমন্ত্রণ** আসে তখন মানুষ যদি গ্রাহ্য না করিয়া আপন আড়তের গদিতেই পড়িয়া থাকে, তবে এমন বৃহৎ অধিকার সে কেন পাইল?[৬]

আমন্ত্রণের উদাহরণঃ

- আকাশে আকাশে আয়োজন, বাতাসে বাতাসে '**আমন্ত্রণ**'[৭]।
- সমাজের আর প্রায় সকল অংশেই ভেদের প্রাচীর প্রতিদিন দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে : কেবল মানুষের **আমন্ত্রণ** রইল জ্ঞানের এই মহাতীর্থে। কেননা এইখানে দৈন্যস্বীকার, এইখানে কৃপণতা, ভদ্রজাতির পক্ষে সকলের চেয়ে আত্মলাঘব। সৌভাগ্যবান দেশের প্রাঙ্গণ এইখানে বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত[৮]।

- সাড়ে নটা বেজেছে ঘড়িতে; /সকালের মৃদু শীতে তন্দ্রাবেশে হাওয়া যেন রোদ পোহাইছে/পাহাড়ের উপত্যকা-নীচে বনের মাথায়/সবুজের **আমন্ত্রণ**-বিছানো পাতায়[৯]।

নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের উদাহরণঃ

- ইহার আগে হেমনলিনীর সঙ্গে রমেশের যতটুকু দূরভাব ছিল, এবারে তাহা আর রহিল না। রমেশ যেন একেবারে ঘরের লোক। হাসিকৌতুক **নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ** খুব জমিয়া উঠিল[১০]।

- আমরা মানুষ, মানুষের মধ্যে জন্মেছি। এই মানুষের সঙ্গে নানাপ্রকারে মেলবার জন্যে, তাদের সঙ্গে নানাপ্রকারে আবশ্যকের ও আনন্দের আদানপ্রদান চালাবার জন্যে আমাদের অনেকগুলি প্রবৃত্তি আছে। আমরা লোকালয়ে যখন থাকি তখন মানুষের সংসর্গে উত্তেজিত হয়ে সেই-সমস্ত প্রবৃত্তি নানা দিকে নানাপ্রকারে নিজেকে প্রয়োগ করতে থাকে। কত দেখাশোনা, কত হাস্যালাপ, কত **নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ**, কত লীলাখেলায় সে যে নিজেকে ব্যাপৃত করে তার সীমা নেই[১১]।

উপসংহার

আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং অন্যান্য বিশেষ উৎসবে অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। এ সব নিমন্ত্রণে সাধারণত খাওয়া দাওয়া অথবা উপভোগ্য কোন কিছুর ব্যবস্থা থাকে। অন্যদিকে, বড় আকারের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের বেলায় আমন্ত্রণ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব অনুষ্ঠানে হালকা জল খাবারের ব্যবস্থা দেখা যায়। নিমন্ত্রণের আরেকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে যেমন, অতিথিরা অনেক সময় নানা রকমের উপহার সামগ্রী নিয়ে আসেন। কিন্তু, আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে উপহার আনার সেইরকম কোনো রেওয়াজ নেই। আবার অনেক সময় নিমন্ত্রিত অতিথিদেরকে আমন্ত্রিত অতিথিও বলা হয়ে থাকে। এটা সম্ভবত বাংলার ভাষাগত সরলীকরণ হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারা জীবন মেপে মেপে শব্দ ব্যবহার করেছেন, তবু দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিমন্ত্রণ ও আমন্ত্রণের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে সেই শব্দই ব্যবহার করেছেন যার নান্দনিক সৌকর্য ও প্রয়োজন সেই বিশেষ মুহূর্তে উপযোগী। ভাষার রাজা আরও অজস্র প্রসঙ্গের মত এখানেও নিয়ম ভেঙে আমাদের শিখিয়ে গেছেন ভাষা নদীর মত, ভাষা আমাদের ভাব প্রকাশের জন্যে, নিয়মের বেড়াজালে তাকে বেঁধে রাখা মোটেও সমীচীন নয়।

এ কথাও ঠিক, রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্মরণে, মননে যে ভাবে মিশে আছেন অজান্তেই আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক চর্যায় তাই তাঁর দেখানো পথ আমরা অনুসরণ না করে থাকতে পারি না। যেমন নিমন্ত্রণ-সভা নিবন্ধে তিনি আক্ষেপ করেছেন যে "আমরা আলাপ-পরিচয়, আমোদ-প্রমোদ, হাস্য-পরিহাস করিতে নিমন্ত্রণ-সভায় যাই না, আহার করিতে যাওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য"। তাঁর এই আক্ষেপ আমাদের বোঝার চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ আহার যেমন ব্যাপক হারে আমাদের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের অঙ্গ, তেমনই খাওয়ার আগে বা পরে নানাবিধ আলাপ আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আমাদের নিমন্ত্রণগুলির বিশেষ অঙ্গ হতে পারে। খাদ্যের অনুষঙ্গ টেনে একটি প্রবাদ প্রযোজ্য হতে পারে "এ পদে ও পদে খাই যে পদে গোবিন্দ পাই"। এখানে বলা বাহুল্য এক পদ যথার্থ অর্থে আহার, অন্যটি মনের খাদ্য।

কৃতজ্ঞতা

এ লেখাটির জন্য কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধনের পরামর্শ দেওয়াতে উদ্দালক ভরদ্বাজ কে আন্তরিক ধন্যবাদ।

তথ্যসূত্র :

১) রবীন্দ্র রচনাবলী>প্রবন্ধ>সমাজ>নিমন্ত্রণ-সভা, পৃষ্ঠা-৪

২) প্রবন্ধ >বিবিধ প্রসঙ্গ> গরীব হইবার সামর্থ্য, পৃষ্ঠা-১

৩) https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/1

৪) গান>পূজা, পৃষ্ঠা-৩১৭

৫) প্রবন্ধ >শিক্ষা> সংযোজন>শিক্ষার বিকিরণ, পৃষ্ঠা-৪৬

৬) প্রবন্ধ>বিচিত্র প্রবন্ধ> বসন্তযাপন, পৃষ্ঠা-৩

৭) গান>বিচিত্র, পৃষ্ঠা-১০৯

৮) প্রবন্ধ>শিক্ষা> সংযোজন>বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, পৃষ্ঠা-৪২

৯) কবিতা >নবজাতক>সাড়ে নটা, পৃষ্ঠা-১

১০) উপন্যাস>নৌকাডুবি, পৃষ্ঠা-৮

১১) প্রবন্ধ>শান্তিনিকেতন>৫>অন্তর বাহির, পৃষ্ঠা-৮

ভজেন্দ্র বর্মন - আমেরিকা, টেক্সাস নিবাসী। নিয়মিত লেখালিখি ও সাহিত্য চর্চায় জড়িত।

দেবীকা ব্যানার্জ্জী

জীবন, ঋতু ও রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু বাংলার ঘরে ঘরে নয়, সমস্ত পৃথিবীর বহু মানুষের হৃদয় জুড়ে, বিশেষত বাঙালীর হৃদয় জুড়ে বিরাজমান। বাঙালীর শিশুকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি যেন এক অন্তরঙ্গ সঙ্গী। মানব অন্তরের অনুভূতি গুলিকে, মানব জীবনকে, গভীর ভাবে উপলব্ধি করে সৃষ্টি করেছেন তাঁর মহান কর্ম তার লেখনী। গড়ে তুলেছেন তাঁর কর্মের প্রকাশ ক্ষেত্র শান্তিনিকেতন। প্রকৃতির ও প্রতি মুহূর্তের রূপ ধরা পড়েছে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে।

এই তো সেইদিন, নববর্ষের কয়েকদিন পরে ভোরবেলায় আমরা কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিলাম বারান্দায় বড় জানালাটির ধারে। হঠাৎ শীতল হাওয়ার সুমধুর স্পর্শে শরীর মন জুড়িয়ে দিল। মনে পড়ে গেল কবির লেখা সেই গানটির কলি।

"বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া আসে মৃদুমন্দ।
আনে আমার মনের কোণে সেই চরণের ছন্দ।।
স্বপ্ন শেষের বাতায়নে ......"

এখন এসেছে জ্যৈষ্ঠ মাস। আছড়ে পড়েছে প্রখর সূর্য কিরণ। উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সকল কিছু তাই কবির ভাষায় ...... "নাই রস নাই, দারুণ দাহন বেলা ...।"

শুধু কি জ্যৈষ্ঠ মাসের দহন, এই প্রখর তাপে সীমান্তে বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল। মনে পড়ল কবির কথা –

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব।
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভ জটিল বন্ধ।।"

মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের অনুভূতির প্রকাশ পাওয়া যায় তাঁর অদ্ভুত সৃষ্টির মধ্যে। কবি যেন মানব হৃদয়ের গহনে প্রবেশ করে তুলে নিয়ে এসেছেন সেসব অনুভূতি। রূপ দিয়েছেন কাব্যে, গানে, নাটকে ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। তাই কি তিনি কবিগুরু। তাই কি তিনি সকলের শ্রদ্ধেয়, সকলের প্রণম্য, এক মহামানব, অর্ন্তযামী। মহাকবিকে স্মরণ করে তাইতো প্রতি বছর "পঁচিশে বৈশাখে" কবির জন্মদিনে আমরা গেয়ে উঠি – "হে নূতন, দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।"

আষাঢ়ের মেঘ আকাশে উঁকি দিলেই আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেই গান –

"আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে,
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।"

বৃষ্টির ছোঁয়ায় আনন্দে ভরে ওঠে মন। কবির ভাষায় –

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে।"

শ্রাবণের ঘন মেঘে আকাশ ছাইলে –

“শ্রাবণের গগনের গায় বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়।”

যখন ভাদ্র, আশ্বিনে আগমন হয় শরৎ ঋতু, তাঁর ভাষাতেই মেঘের কোলে রোদ হেসে ওঠে, শুরু হয় –

“ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরির খেলা”

নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজানো হয় ডালা –

যেমন শরৎ শিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে,

কবির লেখা গানের কলি মনে পড়ে যায় –

“আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে”
“শিউলিতলায় পাশে পাশে ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণ রাঙা চরণ ফেলে নয়ন ভুলানো এলে।”

এই শরতেই দেবী দুর্গার আবির্ভাব ঘটে। পবিত্র বন্ধনে বাঁধি আমরা।

রবিঠাকুরের ভাষাতেই গেয়ে উঠি –

“ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত অম্বর মাঝে,
দিকে দিগন্তরে ভুবনমন্দিরে শান্তি সঙ্গীত বাজে,
হেরো গো অন্তরে অরূপ সুন্দরে, নিখিল সংসারে পরম বন্ধুরে
এসো আনন্দিত মিলন অঙ্গনে শোভন মঙ্গল সাজে।”
বহন করে “হেমন্তে কোন বসন্তেরই বাণী”

পূর্ণ শশী যখন দেখা দেয় আকাশে, যখন শীতের হাওয়া বইতে শুরু করে, ঝরতে সুরু করে গাছের পাতা, আমাদের কণ্ঠ তাঁরই ভাষায় সুর তোলে –

“শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন
আমলকির এই ডালে ডালে
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে
ঝরিয়ে দিল তালে তালে।”

গাছের পাতা ঝরতে ঝরতে শুরু হয় বসন্তের আহ্বান।

“আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা
এসো হে এসো হে এসো হে
আমার বসন্ত এসো।।”

"নীল দিগন্তে ঐ ফুলের আগুন লাগল,
বসন্তে সৌরভের শিখা জাগল।"

আমদের জীবনের বর্ষগুলিতে বাংলার ছয় ঋতু পার করতে করতে একদিন জীবন এগিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে। ঈশ্বরে স্মরণাপন্ন হই আমরা, কবি সেই চরম সত্যটি তাঁর কাব্যেই প্রকাশ করে গেছেন।

"আছে মৃত্যু, আছে দুঃখ, বিরহ দহন লাগে
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।"

নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ –
সেই পূর্ণতার পায় মন স্থান মাগে।"

শাশ্বতী বসু

চন্ডালিনী

"কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া" – তুচ্ছাতিতুচ্ছদের নিয়েই লিখব! যারা পথের ধারে ধারে আপনার বর্ণ সুষমায় আর নিখুঁত অঙ্গ সৌষ্ঠবে সুন্দরের প্রতিমা হয়ে ফুটে ওঠে। তবে তাদের মোবাইলে ফটো তুলি আমি, দেখলেই। বড় করে। তাদের সৌন্দর্য দীপ্ত হয়ে ওঠে ফটোতে। বন্ধুদের পাঠাই। কী ফুল, কী ফুল, বন্ধুরা জিজ্ঞাসু। তোমার বাগানে ফুটেছে ? বলি – না তো, পথের ধারে। এরা অপাঙ্‌ক্তেয়, নিম্ন বর্গের ফুল। গায়ত্রী স্পিভাক চক্রবর্তীর ভাষায় সাবঅলটার্ন। আগাছা। উইড। কারো বাগানে কেউ লাগায় না। আপদ বালাই। তাকে বিদেয় করার জন্য কত স্প্রে, কত লিকুইড, কত পেস্টিসাইড। বেড়াতে গেছিলাম ক্যারলের বাড়ি। সে এক বিজন, অরণ্যপথে তার বাড়ি। টিলার ওপর। বাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। একদিকে সবুজ শ্যামল দিগন্ত বিস্তৃত ফসল খেতের বিন্যাস। আর অন্যদিকে বেগুন রঙা প্রান্তর, হাজার হাজার যোজন জুড়ে বেগুনি রঙের আভা – যেন কেউ বেগুনি আবির ঢেলে দিয়েছে। ওটা কী ফুল ? ঐ যে ঐ বেগুনি রঙের ? কোন ফসলের এমন সুন্দর ফুল ?

– আর বোলো না। অপ্রতিরোধ্য এরা। ক্যারল বলে চলে, hard to get rid of them ! কেন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করি। ওমা তুমি জানো না ? এরা তো Paterson's Curse. অনেক আগে সেই সুদূর ইংল্যান্ড থেকে Mr and Mrs Paterson এসেছিলেন এই দক্ষিণ দেশে। বোধহয় সেটা ১৮৪০ সাল। তাঁদের সাথে এসেছিল কিছু বীজ। তার মধ্যে ছিল এই Paterson's Curse উইডের বীজ। বাগান আলো করে ফুটেছিলেন এঁরা। তারপর থেকে ইনি রাজত্ব করছেন অক্লান্ত। কিছুতেই যায় না। রক্ত বীজের ঝাড়। অনেক অনেক খরচ হয়ে যায় ফার্মারদের কাঁড়ি কাঁড়ি পেস্টিসাইড স্প্রে করতে। ওরা কালই শুরু করবে স্প্রে, ক্যারল বলে।

চোখ যায় সেই দিগন্তবিসারী বেগুনাভ রঙের দিকে। শিউরে উঠি সেই সম্ভাব্য বিনাশ যজ্ঞের কথা মনে করে। ক্যারলের টাটকা হোম মেড অ্যাপল-টার্ট বিস্বাদ লাগে। এটা যে কেন হয়? এই বিদেশে সবে এসেছি। তাই কী সব নতুন আর সুন্দর লাগে, সুন্দরের বিনাশ বিষাদ জাগায় বইকি। কিন্তু এই সুন্দর ফুল নাকি ক্ষতিকর। অল্প দিনেই বাগান ছেয়ে ফেলে। নষ্ট করে ফুল ফলের গাছ। তাই এই বিনাশ যজ্ঞ। কিন্তু মন মানতে চায় না। সকালে উঠেই মনে হল। মনটা যেন দপ করে নিভে গেল।

– কি হল? হয়েছেটা কী?

সঙ্গীর কথায় চমক ভাঙে। বসে আছি একটি ক্যাফেতে। সামনে ধূমায়িত পানীয়।

– কিছু খারাপ খবর? সঙ্গী উদ্বিগ্ন।

– সকালে উঠে আশ্চর্য জানো প্রথমেই মনে পড়ল সেই বেগুনি নিম্নবর্গীয়দের কথা। বললাম আমি।

– মানে?

– মানে আজ তাদের বিনাশ যজ্ঞ।

– কাদের? সঙ্গীর বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

– সেই বেগুনি ফুলেদের। Mr Paterson's curse ...... প্রাণের সখীকে হু হু করে সব বলতে থাকি......

– ও হরি ! তুমি দেখছি আমার মায়ের মত ।

এবারে চমকাই আমি । "আমার মায়ের মত?" একথাটা সহজে কেউ বলে না । মা এর স্থান সন্তানের কাছে এমন একটা জায়গায় তার তুলনীয় এ জগতে আর কেউ নয় । তাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকাই ।

– মা আমার ফোর-লিভস ক্লভার পাগল ছিল একেবারে । মা কে এই জন্য আমরা বিশেষ একটা উপহার দিয়েছিলাম ।

– কী সেই উপহার? আর ফোর-লিভস ক্লভারই বা কী?

– বলব । আগে কাপে চুমুক দাও ।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে হেলগা মোবাইলে গুগল খুলে আমার দিকে এগিয়ে দেয় ।

– তুমি দেখতে থাকো । আমি দুটো প্লেট অর্ডার করে আসি ।

চোখ যায় লেখাটির শিরোনামে – 'উইড' । ও ক্লভার তাহলে আর এক নিম্নবর্গীয় । একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ি । হেলগার মা তাহলে উইড ভালবাসতেন ? পড়তে থাকি ...... ।

"এই ক্লভারের অনেক গুণ । বিনস আর স্নোপিসের যা গুণ, উইড হয়েও ক্লভারের তা আছে । Natueropathyst এর পরামর্শ মত খেলে এরা নাকি রক্ত চাপও কমাতে পারে ।" বাঃ ! খুব ভাল গুণ তো । পড়ার উৎসাহ বেড়ে যায় । "আবার যেহেতু উইড, লম্বায় ছোট ছোট ঘাসের উচ্চতার সমান এবং খুব অল্প সময়ে বৃদ্ধি পেয়ে মাটির উপরিভাগ ঢেকে ফেলে তাই মাটিকে রোদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অনেকেই ক্লভার লাগান ।" আরও একটা গুণ আছে ক্লভারের । এরা ঘন হয়ে জন্মায় । তাই অল্প জায়গাতেই এদের প্রচুর ফুল হয় । মৌমাছি, মথ এবং অন্য পতঙ্গরা খুব তাড়াতাড়ি এক ফুল থেকে অন্য ফুলে যাতায়াত করে মধু সংগ্রহ করতে পারে । এবং দ্রুত পরাগ-সংযোগ করে হয়ে ওঠে এক দক্ষ মধুকর বা pollinator ।

"তবে মথ মৌমাছিদের যেমন ক্লভার থেকে মধু সংগ্রহ করতে সুবিধে তেমনি অনায়াসে মধু সংগ্রহ করতে পারে পাখি, বোলতা মাকড়সারাও, যারা মধু খেতে গিয়ে মথ মৌমাছিও অন্যান্য পতঙ্গদের ও জলখাবার বানিয়ে খেয়ে ফেলে । এই জলখাবার খাওয়ার ব্যাপারটা যদি বেশি বেশি হয়ে যায় তবে পরাগ সংযোগের দ্রুত গতি আসলে কমে যায় শেষমেশ ।"

ওহো ! তাহলে তো মুশকিল বেশ । খুব ভেবেচিন্তেই তাহলে ক্লভার লাগানোর বা একে নষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিতে হয় ।

– কি জানলে ফোর লিভস ক্লভার কী ? হেলগা মিটিমিটি হাসে ।

– ও তাই তো ফোর লিভস নিয়ে কী বলছে গুগল দেখা হয় নি ।

– থাক আর দেখতে হবে না, আমিই বলি । ক্লভারের দেখবে সব তিনটে করে পাতা থাকে । কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালে অনেক সময় চার পাতার ক্লভারও দেখা যায় । যে দেখতে পায় সেই ভাগ্যবান । আমার মা সেই চার পাতা ক্লভার সব সময় খুঁজত । আর দেখতে পেলেই আমাদের সব ভাইবোনকে ডাকতো । ওটা নাকি গুড লাক । মা'র থেকে আমারও এই অভ্যাস হয়ে গেছে । ক্লভার দেখলেই চার পাতার খোঁজ করি । যদি সৌভাগ্যর দেখা মেলে ।

– বাঃ খুব ভালো তো। আমাদের দুই শালিখ দেখার মত ব্যাপারটা।

– সেটা কী ? ডু শ্যালি ?

– দুই শালিখের গল্পটা আরেকদিন বলব খন। তবে মাকে কী স্পেশাল উপহার দিয়েছিলে সেটা বল শুনি ?

– ও হ্যাঁ। মায়ের গ্রেভের হেডস্টোনটা আমরা ফোর-লিভস ক্লভার শেপে বানিয়েছিলাম।

হেলগার মুখে কিশোরীবেলার এক ধূসর অনাবিল হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়।

– এখন থেকে খেয়াল করব তো ফোর-লিভস ক্লভার পাওয়া যায় না কি।

হেলগার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরি। টুকটাক কাজের মধ্যে ক্লভারের কথা আর মনে পড়ে না। শীতের শেষে স্প্রিং এর মাঝামাঝি দক্ষিণ গোলার্ধের এ দেশ দেখি পত্রে পুষ্পে সেজে উঠেছে। বাড়ির পেছনে সীমানার ধারে ধারে ফুটেছে অজস্র ফোটোনিয়া। গাছ ভরে উঠেছে সাদা থোকা থোকা ফুলে। আর ! আর তার তলায় এরা কারা গো ? সবুজ ঘনবদ্ধ উদ্ভিদের ঝাড়। পুরো পেছনের জমির সীমানা জুড়ে। এদের মাথায়ও সেই সাদা সাদা ফুল। দৌড়ে কাছে যাই। আরে এতো সেই হেলগার মায়ের ক্লভার। সেই পাতলা পাতলা তিন পাতাওলা উদ্ভিদ। নেটে যেমন দেখেছিলাম। ঠিক যেন আমাদের দেশে শুশনি শাক। এখন মনে পড়ে, ঠিক তো – শুশনি শাক খেলেও নাকি ঘুম হয়, এমন কথা দেশে থাকতে শুনেছি। ক্লভারও কি যেন ব্লাড প্রেশার ট্রেশার কমায়। একই জাতের এরা তাহলে। কিন্ত দেখতে পাতা গুলো এত সুন্দর, এত নরম যেন মনে হয় কোন জলজ ঘাস। জলেই এদের বেশি মানায়। ফুলগুলো যেন নারসিসাস ফুল। নারসিসাস জলে ফোটে। নারসিসাস ফুলের কেন এমনগ্রীক নাম জান তো? নারসিসাস ছিলেন প্রেমের দেবতা ...

মোবাইল বেজে ওঠে পকেটে।

বান্ধবীর ফোন।

– এই নতুন বাড়িতে চলে আয় না। সামনে পেছনে বেশ খানিকটা জায়গা আছে। কি করা যায় ওখানে প্ল্যান করা যাবে। এখন রাখি। কার্টেন লাগানোর লোক এসেছে। তড়বড় করে বলেই বান্ধবী ফোন ছেড়ে দেয়।

তো যাই একদিন সময় করে। লাল টুকটুকে টাইল দেওয়া ছাদের ছোট একটা বাড়ি। বাড়ি শুনশান। কেউ নেই নাকি ? কোন সাড়া নেই কেন ? বাড়ির সামনে বাঁধানো চাতালে ছোট্ট আয়রন কাস্টের নকশা করা দুটো চেয়ার আর টেবিল। তার পাশেই বেশ একটু জায়গা জুড়ে লন। লন না বলে সম্ভাব্য লনের জায়গা বলাই ভাল। ঘাসে ঢাকা জমি। অযত্ন বর্ধিত। ওটা ছেড়ে বাড়ির পেছনে চলে যাই। বাবা! এখানে অনেক জায়গা জুড়ে জমি। তাকিয়েই হঠাৎ চোখ আটকে গেল। জমির মাঝে মাঝে বিঘৎ খানিক উঁচু একটু মোটা মোটা ঘাসে ফুটে আছে হালকা ঘিয়ে রঙের ছোট ছোট ফুল। কী ফুল ওগুলো ? ছুটে যাই সামনে। ওমা কি সুন্দর! ঠিক যেন রজনীগন্ধা। তার দীঘল তনুলতাকে একটু ছেঁটে দিলেই পাওয়া যাবে এই ঘাসফুলকে। ঘাস ফুল ? কি ভাবলাম আমি ? ঘাস ফুল! দেখতে দেখতে স্মৃতির সরণীতে দৃশ্যরা পরপর ভেসে উঠতে থাকে .....

বিকেল পাঁচটা। মা কাকিমা, জ্যেঠিমারা সব শীতল পাটি মেঝেতে বিছিয়ে বসেছেন। দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়েছেন কেউ কেউ। কোণার দিকে দিলু কাকিমা পান সাজছেন। কাঁসার ঝকঝকে পানের ডাবর। ভেজা নরম কাপড়ে পান জড়িয়ে তার মধ্যে রেখেছেন মা। কাটা সুপুরি রয়েছে ছোট কাঁসার বাটিতে। চুন রয়েছে একটা ছোট্ট ঢাকনা দেওয়া চিনে মাটির পাত্রে। আরও ছোট ছোট কৌটোতে ছোট এলাচ, মৌরি, টুকরো করা খয়ের ইত্যাদি আরও কী কী সব পানের মশলা রয়েছে। দিলু কাকিমা বলছেন,

– পান তো নয় যেন পাঁপড় ভাজা, এমনি কড়মড় করছে .....

এই বলে তিনি নিজে সাজা পান একটা প্লেটে পরিপাটি সাজিয়ে সবাইকে দিচ্ছেন। নিজেও একটা মুখে পুরলেন। মুচমুচে শব্দ হল। তারপর বটুয়া থেকে একটা ছোট্ট কৌটো বার করে দু আঙ্গুলে টিপে কি একটা মশলা নিয়ে মুখে পুরলেন। কি সুন্দর একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিক। ঠোঁট দুটো লাল হয়ে গেল। গলার মোটা বিছে হার, ভারি কানপাশা, মস্ত খোঁপা আর লাল টুকটুকে ঠোঁট নিয়ে দিলু কাকিমা আয়েস করে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসলেন। ছোট আমি অবাক চোখে সব দেখছি। তারপর মুখের পান সামলে বললেন,

– কই রে ! মেয়েরা কোথায় গেলি সব ? কী নাচ দেখাবি আজ ? শুরু করে দে। সবার জন্যই মালা আছে। তবে আজ একটা স্পেশাল প্রাইজ আছে। যে সবচেয়ে ভাল নাচবে তার জন্য। ঘাস ফুলের মালা। দেখবি কি সুন্দর!

রাঙ্গাকাকার মেয়ে তুলতুলিদি ছোট থেকেই খুব সুন্দর নাচতে পারত। ও একটা লাল হলুদ শাড়ি কোমরে জড়িয়ে – "সূর্য তোথা যাও তেনো দো লুপাও, সূর্যমুখি দাতে তোমায় দাও দো সাড়া দাও।" এই বলে নাচ শুরু করে দিল এবং তারপরে এবং তারপরে কত যে নাচল তুলতুলিদি তার ঠিক নেই। পাঁচ বছরের তুলতুলিদির হাত পা নাড়া আর আধো আধো কথার গান শুনে দিলু কাকিমা নাচ শেষে তুলতুলিদিকে কোলে তুলে নিলেন। চুমু খেলেন। তারপর ঘাস ফুলের মালা তাকে পরিয়ে দিয়ে। বললেন,

– তুই তো আমার সূর্যমুখী।

দিলু কাকিমার কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। আমি তখন পাশেই বসা। সেই তিন বছর বয়সেই ঘাসফুলের গোলাপি রঙ আর তার চেহারা আমার চোখে মায়াঞ্জন পরিয়ে দিয়েছিল। স্মৃতির পটে চিরদিনের ছাপ পড়েছিল ঘাসফুলের।

এই আমার সেই প্রিয়তম ঘাসফুল। তবে চাঁপা রঙের। কিছু আসে যায় না .....

– কী এত মন দিয়ে দেখছিস? এটা তো উইডের ফুল। বিরক্ত বান্ধবীর গলা শুনি পাশে।

– না এটা উইড নয়। এটা ঘাসফুল। জোর দিয়ে বলি আমি। ঘাড় না ঘুরিয়েই।

– ঘাস ফুল ? হলেই বা ! দুদিন পরে লন ছাঁটতে আসবে। সেই উইড কিলার স্প্রে করে ঘাসের বীজ ছড়িয়ে দেবে। আমি শিউরে উঠি। আবারও!

– চল এখন! ফ্রেঞ্চ টোস্ট জুড়িয়ে যাচ্ছে। কখন থেকে ডাকছি তোকে। কানে কি আজকাল কম শুনিস ?

বান্ধবী গজগজ করতে থাকে। উত্তর দিই না। চুপচাপ হাঁটতে থাকি। জানি অসাধারণ সব সুন্দর সুন্দর ফুল রয়েছে এই উইডের। তবু তাদের .....

দিন যায়। আজ সরস্বতী পুজো। সকাল থেকেই দেশের সরস্বতী পুজো মিস করছি। তো হঠাৎ ঠিক করে ফেললাম আজ পুজো করবো। বাগদেবীর মূর্তি নেই, ফটো নেই। কোন ব্যাপারই নয়। ঝটিতি প্রিন্ট আউট নিয়ে নিলাম। নারকেল কুল ? দরকার নেই। সুগার পাম আছে কী করতে? এলসটোনিয়া, মানে ছাতিমের পল্লব বসলো ঘটের ওপর। বটল ব্রাশের ডাল কাটতে গেছি ব্যাক ইয়ার্ডে, খাগের কলম এর জন্য। ক্লভার এর ঝোপ নষ্ট করার পর অনেকদিন সেখানে যাই নি। গিয়েই দেখি, ওমা! ব্যাকইয়ার্ড আলো করে ফুটে আছে হলুদ অজস্র ফুল। ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে। ভাল করে নজর করি। আরে! ঠিক যেন ক্রিসান্থিমাম। তবে ছোট। বলা যায় ক্রিসান্থিমামের গরিবী সংস্করণ। হলে কী হবে? অপূর্ব তার সুষমা। কি ফুল এটা ? নেট বলল, ড্যান্ডেলিয়ন। ওহো! ইনিই তবে সেই ড্যান্ডেলিয়ন? আমি তো একে জানি।

একটি বিদেশি গল্প পড়েছিলাম না এই নামে ? হ্যাঁ এই নামেই তো। কোন লেখকের – আজ আর ঠিক মনে পড়ছে না আরনেস্ট হেমিংওয়ের না কার যেন। গল্পটার নাম "ড্যান্ডেলিয়ন"। সে যে কি সুন্দর গল্প কী বলব ! একটি প্রেমিক যুগলের প্রেম যখন জোয়ার ভাঁটায় উচ্ছল তখন ভাগ্যের পরিহাসে হঠাৎ একদিন তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কেউ কারো ঠিকানা জানতে পারে না শেষ মুহূর্তেও। নেমে আসে দুজনের মাঝে এক দীর্ঘ বিচ্ছেদ। ছেলেটি কী করল জানা নেই। মেয়েটির কথা আমরা জানতে পারি। মেয়েটি অন্য দেশে এসে একটি রেস্তঁরাতে টাইপিস্টের চাকরি নিয়েছে। যেখানে তার প্রতিদিনের কাজ হল সেদিনকার মেনু টাইপ করা। যে মেনু প্রত্যেক টেবিলে থাকবে। সেই রেস্তোঁরার একটি বিখ্যাত মিষ্টি ছিল ড্যান্ডেলিয়ন এর নামে। খুব কাকতালীয় ভাবে এই মিষ্টি পদটির জন্যই প্রেমিক যুগলের আবার মিলন হল।

তাহলে! তাহলে এই ড্যান্ডেলিয়নই হবে আজ আমার পুজোর হলুদ গাঁদা। তুলে নিলাম সাজি ভরে। মালা গাঁথলাম। বাগদেবীর গলায় পরালাম। অপূর্ব। নিমেষে যেন আলো হয়ে উঠলো চারিদিক। পুস্পপাত্র থেকে তুলে নিলাম ড্যান্ডেলিয়ন আর চন্দন।

– জয় জয় দেবী .....

বাগদেবীর চরণপ্রান্তে পড়লো পুস্পাঞ্জলি। ড্যান্ডেলিয়ন যেন খুশীতে হেসে উঠলো।

মনে বেজে উঠল রবি ঠাকুর এর চন্ডালিনী –

"জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
দয়া করে দাও ভুলিতে
নাই ধূলা মোর অন্তরে,
ফুল বলে
ধন্য আমি ধন্য আমি মাটির পরে।"

শাশ্বতী বসু – বর্তমানে সিডনী বাসী। অবসরপ্রাপ্ত সময় কাটে বিভিন্ন ভাল লাগার চর্চা করে। তার মধ্যে পড়া, লেখা, বেড়ানোও আছে। লিখি একটু আধটু, কারণ না লিখে পারি না। গুরুচণ্ডালী, চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম, আবহমান, বাংলালাইভ, প্রতীচী ইত্যাদিতে লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

সুজয় দত্ত

আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী

"কূপমণ্ডূক" শব্দটার মানে কোন ক্লাসে পড়ার সময় প্রথম জেনেছিলাম, আজ আর মনে নেই। তবে জীবনের প্রথম বারোটি বছর আমি নিজে যে একটি আস্ত কূপমণ্ডূক ছিলাম সেটা অস্বীকার করা যাবে না। নিজের পাড়া, স্কুল, কোচিং ক্লাস আর বাড়ীর কাছেই হাঁটা দূরত্বে দুটো পার্ক – এই ছিল আমার জগৎ। পড়ুয়া ছেলে বলে পরিচিতি ছিল, রাতদিন পাঠ্যবইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতাম, আর বছর বছর পরীক্ষায় ফার্স্টপ্রাইজ সেকেন্ড প্রাইজে যে গল্পের বইগুলো দিত সেগুলোও সঙ্গে সঙ্গে গোগ্রাসে গিলতাম। এমনি করেই ক্লাস ফাইভের বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর পর হাতে এল "আমার ছেলেবেলা" বইটা। দেখলাম ক্লাস টু আর ক্লাস থ্রি-র পাঠ্যবই 'সহজপাঠ'-এর মলাটে যে দাড়িওয়ালা মুখটা আঁকা থাকে, এটা তাঁরই লেখা।

সেই বছরই প্রথম আমার বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া। সেবার শীতের ছুটিতে পুরী গেছিলাম আমরা। 'আমরা' মানে আমি, মা, বাবা আর বাবার অফিসের একদঙ্গল বন্ধুবান্ধব। লম্বা ট্রেনজার্নির রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাকেও ছাপিয়ে গেল সমুদ্রতটের চিকচিকে বালিতে ঝিনুক কুড়োনো আর ঢেউয়ের সাদা ফেনায় পা ভেজানোর আনন্দ। কিন্তু ওসবের ফাঁকে ফাঁকে যখনই একটু অলস সময় পেয়েছি, সমুদ্রের অনতিদূরে সরকারী গেস্টহাউসের বারান্দায় নোনা হাওয়ায় বসে বা রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পাতা উল্টে গেছি সদ্য প্রাইজ পাওয়া সেই শক্ত মলাটের বইটার। মনের কল্পনায় সারাক্ষণ জড়িয়ে ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর এক দুষ্টু ছেলের শিশুবয়সের গল্প।

এর পর আবার বেড়াতে যাওয়া ক্লাস সেভেনের গরমের ছুটিতে। বীরভূমের রামপুরহাটে। এক্ষেত্রে অবশ্য উপলক্ষ্য ছিল একটা। আমার চেয়ে অনেক বড় এক মাসতুতো দিদির বিয়ে। আমার কাছে দুটোই নতুন – বীরভূম এবং গ্রামের বিয়েবাড়ী (তখনকার দিনে রামপুরহাট গ্রামই ছিল)। মনে আছে, কলকাতার মামাবাড়ীর সব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে হৈহল্লা করতে করতে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে রামপুরহাটের ট্রেনে উঠে দেখলাম কামরার এক-চতুর্থাংশই আমাদের দখলে। অতএব অনেকগুলো জানলা। তাই জানলার ধারের সীট পেয়ে গেলাম সহজেই। অবশ্য জানলা যদি একটাই হত, সেটাও আমি চাইলে নির্ঘাত আমাকেই ছেড়ে দিত সবাই, কারণ আমি বাড়ীর সব্বার ছোট – আমার আদরই আলাদা। যাইহোক, ট্রেন ছাড়ল আর শুরু হল আমার স্টেশন – শুমারি, অর্থাৎ পথে যে স্টেশনগুলো পড়ছে, গুনে গুনে তাদের নামের তালিকা বানানো। সব স্টেশনে তো আর ট্রেন থামে না, তাই ছোট ছোট যে স্টেশনগুলো হুশ হুশ করে বেরিয়ে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে, তাদের নামের পাশে প্রশ্নচিহ্ন দিয়ে রাখা ছাড়া উপায় নেই। বর্ধমান জংশনে ট্রেনে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন খুলে কয়লার ইঞ্জিন জুড়তে জুড়তে আমাদের কয়েক রাউন্ড সীতাভোগ-মিহিদানা আর খাজা-ল্যাংচা খাওয়া হয়ে গেল। আর তারপরেই বুঝলাম জানলার ধারে বসার বিপত্তি – চোখে বারবার ইঞ্জিনের কয়লার গুঁড়ো এসে পড়ছে আর চোখ কড়কড় করছে।

এমনি করেই সন্ধ্যের মুখোমুখি আরেকটা বেশ বড় জংশনে ট্রেন ঢুকল মন্থর গতিতে। বাইরে বড় বড় হরফে "বোলপুর" লেখাটা নজরে আসতেই মা-মাসীরা হাতজোড় করে কপালে ঠেকাচ্ছে দেখে জিজ্ঞেস করতে যাব এখানে কোন ঠাকুরের মন্দির (কারণ বেশ কয়েক ঘন্টা আগে ট্রেন বালিব্রিজ পেরোনোর সময় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরকেও পেন্নাম ঠুকেছিল ওরা), ঠিক সেই সময় একজন হকার কামরায় ঢুকে উঁচুগলায় "ভাল শান্তিনিকেতনী ব্যাগ আছে, ভাল কাঁথাস্টিচ, বাঁশের কাজ, পোড়ামাটির কাজ, পটচিত্র পাবে-এ-এ-ন" বলতে বলতে এদিক এদিক ঘোরাঘুরি শুরু করল। ধাঁ করে মনে পড়ে গেল আমার – আরেঃ, এই বোলপুরেই তো শান্তিনিকেতন আর শান্তিনিকেতন মানে তো সেই

সহজপাঠের দাড়ি-অলা ভদ্রলোক। আমার চেয়ে বছর পনেরোর বড় মাসতুতো দাদা প্লাটফর্মে চায়ের খোঁজে নামছে দেখে আমিও বায়না ধরলাম সঙ্গে যাব। সামনেই একটা ছোটখাটো বইয়ের স্টল, তাতে অন্য অনেককিছুর সঙ্গে ঝুলছে কয়েকটা ছোটদের কমিক্স আর ছবির বইও। তার মধ্যে চোখে পড়ল বেশ রংচঙে একটা বই – "অমর চিত্রকথায় রবীন্দ্রনাথ"। আমি সেটার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছি দেখে দাদা মুচকি হেসে দোকানীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ দরদাম করে বইটা গুঁজে দিল আমার হাতে, তারপর তাড়া লাগাল, "চ চ পা চালিয়ে চ, চা নিয়ে ট্রেনে ফিরতে হবে না?" আমি তখন নেশার বস্তু পেয়ে গেছি, ওসব দিকে আর খেয়াল নেই। ট্রেনে উঠে স্বেচ্ছায় জানলার ধার ছেড়ে দিয়ে কামরার কমজোরী আলোয় ওই বইটায় ডুবে গেলাম। তার পরের চারদিনও বিয়ের আসরের ফাঁকে ফাঁকে অজস্রবার পাতা উল্টেছি ওই চটি বইটার।

আমি স্কুলে থাকতে মা-বাবার সঙ্গে শেষবার দূরপাল্লার বেড়ানোটা হয়েছিল পুজোর সময়। আমার তখন ক্লাস এইট। আমরা যে কেন্দ্রীয় সরকারী আবাসনের ফ্ল্যাটে থাকতাম, তার ঠিক সামনের মাঠেই বেশ বড় করে প্যান্ডেল বেঁধে দুর্গাপুজো হত। সেই প্যান্ডেলের বাঁশ, কাপড় আর দড়ি তখন সবে মাঠে এনে ফেলেছে ডেকরেটর, আমরা ব্যাগ-স্যুটকেস গুছিয়ে অনেক শীতের জামাকাপড় নিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম। আবার সেই হাওড়া স্টেশন – এবার অবশ্য গন্তব্য অনেক, অনেক দূরে। প্রায় বাইশশো কিলোমিটার পথ পেরিয়ে আমরা যাব কাশ্মীর। পথে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির আর জম্মুর দর্শনীয় স্থানগুলো বাড়তি পাওনা। বাবার অফিসের সহকর্মীদের একটা বড়সড় দল চলেছে সঙ্গে, তার মধ্যে আমার বয়সী বা আমার চেয়ে ছোট গুটিকয়েক ছেলেমেয়েও আছে। তবে ওদের চেয়েও যে দুজনের সঙ্গে আমার ভাব জমে উঠল বেশী, তারা হলেন মায়াপিসি আর শান্তাপিসি। মায়া গুহনিয়োগী আর শান্তা বসু-আচার্য্য। নামদুটো আজও মনে থাকার কারণ ঐরকম পদবী আমি এর আগে শুনিনি। আমাদের অর্থাৎ ছোটদের নানারকম মজার মজার গল্প বলে, বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেনের জানলা দিয়ে হকার ডেকে এটা-ওটা কিনে দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই খুব কাছের মানুষ হয়ে গেলেন। কিন্তু তখনও আমরা জানিনা তাঁদের আসল গুণের কথা। সেই রাতে ট্রেন যখন পশ্চিম বিহার পেরিয়ে উত্তরপ্রদেশের দিকে ছুটে চলেছে, আমাদের রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ, তখন আমাদের কম্পার্টমেন্টের আলো নিভিয়ে আবছা নীল নাইটলাইট জ্বেলে বাবার কিছু বন্ধুবান্ধব আবদার করলেন, "মায়া, শান্তা, চলো এবার একটু হয়ে যাক"। খানিকক্ষণ "না না না না" করে মৃদু প্রতিবাদের পর ওঁরা রাজী হলেন। আশপাশের কম্পার্টমেন্ট থেকে আমাদের দলের আরো লোকজন এসে মেঝেতে শতরঞ্চি পেতে বসলেন। আর তারপর বুঝলাম কী করতে বলা হচ্ছে ওঁদের। প্রায় পৌনে একঘন্টা ধরে সুরেলা গলায় একটার পর একটা গান গেয়ে মাতিয়ে রাখলেন সবাইকে। গানগুলো এখন আর মনে নেই, শুধু দুটো ছাড়া। মায়াপিসির প্রথম গান "আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে" আর শান্তাপিসির শেষ গান "মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি"। আসলে ট্রেনের জানলার বাইরে মাঠেঘাটে তখন সত্যিই মায়াবী জ্যোৎস্না, অপূর্ব দৃশ্যপট। সেই ছবিটা মনে গেঁথে আছে বলে মায়াপিসির গানটাও ভুলিনি। আর দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে এক আমুদে ভদ্রলোক আমার বাবাকে ঠাট্টা করে বলে উঠেছিলেন, "বীণা কোন সুরে বাজে তা সুবিমল-দার চেয়ে ভাল আর কে জানে?"। আমার মায়ের নাম তো বীণা, তাই এই রসিকতা।

যাইহোক, সেই সফরে আরো একবার দুই পিসির জাদুকন্ঠের পরিচয় পেয়েছিলাম আমরা। সে অভিজ্ঞতা আরোই অবিস্মরণীয়। এক হিমশীতল কুয়াশাঘেরা সকালে গুলমার্গ আর পহেলগাঁও বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল আমাদের। গুলমার্গের স্বর্গীয় নিসর্গশোভার মধ্যে দুপুরের খাওয়া সেরে বিকেলে যখন পহেলগাঁও পৌঁছলাম, ভিজে ভিজে সবুজ ঘাসে মোড়া বিস্তৃত সেই প্রান্তরে তখন পড়ন্ত বেলার সোনারোদ। গাইড সহিস ডেকে আমাদের কয়েকজনকে ঘোড়ার পিঠে চড়াল, ফেরার পথে একটা বাজার থেকে কেউ কেউ কিনল কাশ্মীরের বিখ্যাত আপেল আর আখরোট। ক্লান্ত শরীরে হোটেলে পৌঁছে তাড়াতাড়ি পোশাক-টোশাক বদলে নিয়ে সবাই এসে বসল বড় হলঘরটার ফায়ারপ্লেসের সামনে। জ্বলন্ত কাঠের উত্তাপ গায়ে মেখে ধূমায়িত কফির কাপ আর পকোড়ার প্লেট হাতে নিয়ে সেই যে আড্ডা শুরু –

আর থামতেই চায় না। এবং খানিক বাদে আড্ডার আসরে মায়াপিসি শান্তাপিসি হাজির হতেই আবার সমবেত বায়না গান শোনাবার। এদিন অবশ্য হল আধুনিক আর সিনেমার গান। কিন্তু তারই মধ্যে ছিল 'দাদার কীর্তি' ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া হৃদয়স্পর্শী সেই গানটি – "চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে"। দাড়িবাবুর থেকে পালাবে কোথায় বাঙালী?

তার পরের কয়েক বছর জীবনে পরিবর্তনের ঝড়। বয়ঃসন্ধিতে গলার স্বর পাল্টালো, ঠোঁটের ওপরের আর চিবুকের জমি উর্বর হয়ে উঠল, মাধ্যমিক আর উচ্চমাধ্যমিকের গন্ডী পেরিয়ে স্কুল ছেড়ে চললাম কলেজে। ওই পরীক্ষাদুটো আর তাদের লেজুড় আরো নানারকম এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতিতে কোথা দিয়ে যে সাড়ে চার বছর কেটে গেছে, বুঝতেই পারিনি। বেড়াতে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। সেটা আবার শুরু হল কলেজে গিয়ে, যখন দেখলাম প্রতি বছর ডিসেম্বরে শীতের ছুটিতে এডুকেশনাল ট্যুরে নিয়ে যাওয়া হয় ছাত্রছাত্রীদের। প্রথম বছর একটা বিশেষ কারণে যেতে না পারলেও সেকেন্ড ইয়ারে ভীড়ে গেলাম সেই দলে, ব্যাগ-স্যুটকেস গুছিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে চেপে রওনা দিলাম গুয়াহাটি। সেখান থেকে বাসে শিলং। সেই বাসজার্নির কথা জীবনে ভুলব না। একে তো যাদের সঙ্গে যাচ্ছি তাদের মতো হুল্লোড়বাজ আর হুজুগে পার্টি আর দ্বিতীয়টি নেই। তার ওপর সেই উঁচুনীচু পাহাড়ি রাস্তায় একের পর এক লালমাটির টিলা আর পাকদণ্ডী পেরিয়ে বাস এমন বেপরোয়া গতিতে চলছিল যে প্রতি মুহূর্তেই ভয় এই বুঝি পাশের খাদে পড়লাম। মোশন সিকনেস আছে – এমন কেউ কেউ তো বমিই করে ফেলল। এরই মধ্যে সারাটা রাস্তা কোরাস গান গেয়ে মাতিয়ে রেখেছিল আমাদের একদল প্রাণোচ্ছল সহপাঠী। সেই সময়কার একটা ভীষণ জনপ্রিয় লোকসংগীত "লালপাহাড়ীর দ্যাশে যা, রাঙামাটির দ্যাশে যা, হিথাক তুকে মানাইছে নাই গো" যখন ওরা বারবার অনভ্যস্ত গলায় গাইছিল, বাইরের গোধূলির আলোয় আবছা হয়ে আসা উঁচু উঁচু সব লালপাহাড়ের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, এমন অভিজ্ঞতা কী জীবনে আর কখনো হবে? একসময় গানের ফাঁকে একজন আবৃত্তি শুরু করল, "দুন্দুভি বেজে ওঠে দ্রিম দ্রিম রবে / সাওঁতাল পল্লীতে উৎসব হবে" কবিতাটা। শুনেই মনে পড়ল, এই তো সেই শিলং যেখান থেকে ওই কবিতার কবি লিখেছিলেন "শিলং-এর চিঠি" আর "শেষের কবিতা"। পরে একদিন শিলং-এর ইস্ট খাসি হিলস এলাকায় রিলবং বলে জায়গাটা দেখতে গেছিলাম আমরা, যেখানে কবি দুবার এসে থেকেছেন। আপল্যান্ড রোডের যেখানে 'সিডলি হাউস' ছিল এককালে, সেখানটাও খুঁজে খুঁজে দেখতে গেছিলাম, কারণ সেই বাড়ীটিও আমাদের জোড়াসাঁকোর নোবেল লরিয়েটের স্মৃতিধন্য।

পরের শীতে কলেজ কর্তৃপক্ষ ঠিক করল গন্তব্য হবে পাঁচগনি-মহাবলেশ্বর। মুম্বাই হয়ে। এই সফরেও কবিগুরু সঙ্গী ছিলেন আমার, তবে একটু অন্যভাবে। বাবা সে-বছর চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের সময় সহকর্মীদের কাছ থেকে উপহার হিসেবে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে একটা ব্যাটারীচালিত টেপরেকর্ডারও পেয়েছিলেন। টেপরেকর্ডার বস্তুটা তখন খুব বেশীদিন বাজারে আসে নি, আমার কাছে তো একেবারেই নতুন। আমি ওটার নেশায় পড়ে গেলাম। গুটিকয় মাত্র ক্যাসেট (কারণ ক্যাসেটের দাম তখনকার দিনের টাকায় খুব একটা কম ছিল না), সেগুলোই বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুনি। মুম্বাই যাওয়ার সময়েও বায়না ধরলাম ওটা সঙ্গে নিয়ে যাব। এর মাসদেড়েক আগে পুজোর সময় জ্যাঠতুতো দাদা-বৌদির কাছে উপহার পেয়েছিলাম একটা নতুন ক্যাসেট। প্রখ্যাত গীটারবাদক সুনীল গাঙ্গুলির হাতে ইলেকট্রিক গীটারে রবীন্দ্রসংগীতের সুর। আমার অতি প্রিয় বেশ কয়েকটা গান ছিল অ্যালবামটায় – "তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম", "দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে", "অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে", "দুজনে দেখা হল মধুযামিনী রে", ইত্যাদি। পাঁচগনি-মহাবলেশ্বরে থাকাকালীন হোটেলে রাত্রিবেলা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার আসরে ব্যাকগ্রাউন্ডে চালিয়ে দিতাম সেইসব সুর। ওরাও উপভোগ করত।

আমার ফাইনাল ইয়ারে শেষবারের মতো শীতকালীন সফরে বেরোলাম যে দলটার সঙ্গে, তার বেশীরভাগ লোকজনই আগের ট্যুরগুলোতেও গেছে। আনকোরা নতুন অর্থাৎ ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রছাত্রীও ছিল কিছু, তাদের

দেখভালের দায়িত্ব সিনিয়র হিসেবে আমাদের ওপরেই। যাওয়া হচ্ছে কালিম্পঙ আর গ্যাংটক। প্রথমে দার্জিলিং মেলে চেপে নিউ জলপাইগুড়ি, তারপর সেখান থেকে বাসে কালিম্পঙ। কালিম্পঙে মাত্র এক দিন থাকা, তাই যা যা দেখার তার মধ্যেই দেখে নিতে হল। সকালে ধর্মকর্ম, অর্থাৎ মঙ্গলধাম মন্দির আর গেডেন থারপা চোলিং বৌদ্ধমঠ। বিকেলে উদার প্রকৃতির কোলে – ডেলো পার্ক আর পাইনভিউ নার্সারিতে। তবে এরই মধ্যে স্থানীয় লোকেদের কাছে খবর নিয়ে আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছি আপার কার্ট রোডের গৌরীপুর ভবন, যেখানে বিশ্বকবি মৃত্যুর অল্প কিছু বছর আগে থেকেছিলেন। সেখানে গিয়ে জানলাম ময়মনসিংহের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এককালে এই প্রাসাদোপম বাড়ীটি তৈরী করান। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে বারতিনেক এখানে উঠেছিলেন কবিগুরু। একবার মংপু গ্রামেও ছিলেন, যা এখান থেকে মোটামুটি কাছেই। এই সেই মংপু যার কথা ছোটবেলার ভূগোল বইতে থাকত সিঙ্কোনা চাষের দৌলতে।

তবে এই সফরটা বিশেষ করে মনে আছে যেদুটো ঘটনার জন্য, সেগুলো ঘটেছিল গ্যাংটকে। প্রথমটাকে সত্যজিৎ রায়ের ভাষায় 'গ্যাংটকে গন্ডগোল' বলাই যেতে পারে। আমাদের হোটেল 'সানশাইন' ছিল গ্যাংটকের হোটেলপাড়ায়, বজ্র ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের কাছে। এক কনকনে ঠান্ডা রোদঝলমলে সকালে আমরা একটা গাড়ী ভাড়া করে বেরোলাম এঞ্চে বৌদ্ধমঠ আর ৎসুগলাখাং বৌদ্ধমন্দির দেখতে। প্রাতঃরাশ সেরেই বেরোতে হয়েছিল একটু তাড়াহুড়ো করে, তাই সবাই হয়তো বাথরুম ঘুরে আসতে পারেনি। মাঝরাস্তায় একজনের জরুরী দরকার পড়ল হালকা হওয়ার। একটু আগেই সে ব্রেকফাস্ট টেবিলে "আঃ, চমরী গাইয়ের দুধ দেওয়া চা, এর স্বাদই আলাদা" বলে বেশ কয়েক কাপ খেয়েছিল। আমরা ঠাট্টা করে বললাম, "নে, এখন বোঝ চমরী গাইয়ের ঠ্যালা"। যাইহোক, ওখানে প্রতি রাস্তার বাঁকে বাঁকে পাবলিক টয়লেট তো ছিলনা (এখনও আছে কিনা জানিনা)। আর আমাদের ড্রাইভার দেখলাম যেখানে সেখানে গাড়ী থামিয়ে কম্মো সারতে দিতে একেবারেই রাজী নয় – গন্তব্য অবধি অপেক্ষা করে থাকতে বলল। শেষে অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর বড়রাস্তা ছেড়ে পাশের এবড়োখেবড়ো জমিতে গাড়ী নামাল যাতে সামনেই ছোটখাটো পাইনঝোপটার আড়ালে ব্যাপারটা মিটিয়ে আসা যায়। আর নামাতে গিয়েই বিপত্তি। ছড়ানো পাথরের টুকরোর খোঁচাতে কিংবা অন্য কোনো কিছুতে বিঁধে গাড়ীর টায়ার গেল ফেঁসে। এমনই দুর্ভাগ্য, বাড়তি টায়ারও নিয়ে বেরোয়নি ড্রাইভার। ব্যস, ওখানে গাড়ীতে বন্দী হয়ে বসে থাকা বেশ কয়েক ঘন্টা। হেঁটে হোটেলে ফেরার উপায় নেই, বেশ খানিকটা দূর ওখান থেকে। পাইনঝোপের টয়লেট শেষমেষ শুধু আমাদের "চমরী গাইয়ের" নয়, আরও অনেকেরই কাজে লাগল।

দ্বিতীয় ঘটনাটা আরও মজার। সফরশেষে ফেরার সময় গ্যাংটকের হোটেলের সামনে বাসের ছাদে সকলের মালপত্র তোলার ব্যাপারে আমিও হাত লাগিয়েছিলাম। তখন খেয়াল করিনি যে ফার্স্ট ইয়ারের একটি মেয়ের স্যুটকেস আর আমার স্যুটকেস এক্কেবারে একরকম দেখতে। এক মডেল, এক রং, একই রকম জিপার দেওয়া এবং কোনোটাতেই মালিকের নাম লেখা নেই। হাওড়া স্টেশনে যখন দার্জিলিং মেল থেকে সবার জিনিসপত্র প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে ডাঁই করা হল, আমি তড়িঘড়ি আমার স্যুটকেস খুঁজে নিয়ে ট্যাক্সি ধরতে ছুটলাম বন্ধুদের সঙ্গে। বাড়ী এসে সকলকে কালিম্পঙ আর গ্যাংটক থেকে কেনা ছোটখাটো স্যুভেনিরগুলো দেখাবো বলে স্যুটকেস খুলতেই লজ্জায় মাথা হেঁট। এমন এমন জিনিস বেরোচ্ছে সেটা থেকে যে বৌদি হাসি চেপে চোখ টিপে বলল, "ও, তলে তলে এই খেলা চলছে তোমার ?"। দিদি ফিসফিস করল কানে কানে, "কে রে মেয়েটা? অ্যাট লিস্ট আমাকে বল"। মা-বাবার মুখ গম্ভীর। সে-যাত্রা বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল সবাইকে বোঝাতে যে ওটা নেহাতই একটা কমেডি অফ এরর, গূঢ় কোনো কাহিনী নেই ওর পিছনে। স্যুটকেসটা আসলে কার, সেটা বের করতে অবশ্য খুব বেশী সময় লাগেনি। কারণ সংযুক্তার বাড়ীতেও নিশ্চয়ই একই পরিস্থিতি (হ্যাঁ, মেয়েটির নাম সংযুক্তা) – শুধু তফাতের মধ্যে এই যে আমার স্যুটকেসের একটা খোপে আমার নাম লেখা একটা বই ছিল। যে-সে বই নয়। একটা পকেট গীতাঞ্জলি। যেখানেই যেতাম, বইটা থাকত আমার সঙ্গে। আর আমি তিন বছরের সিনিয়র হলেও আমার এই কবিতাপ্রীতির কথা ও ভালই জানত। কলেজ

সোশ্যালে শুনেছে আমার আবৃত্তি। বৌদি যে "খেলা"র কথা বলছিল, সেটা ওর সঙ্গে আমার ছিল না ঠিকই, কিন্তু সেই কলেজ জীবন থেকে আজ অবধি আমরা পরস্পরের বন্ধু রয়ে গেছি। ঘটনাটা জানার পর থেকে ওর জীবনসঙ্গী আর আমার জীবনসঙ্গিনী আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হলেই ওই প্রসঙ্গ তুলে হাসাহাসি করে। তবে হ্যাঁ, জোড়াসাঁকোর সেই ভদ্রলোকের নোবেলজয়ী বইটি না থাকলে কিন্তু বেশ মুশকিল হত স্যুটকেস ফিরে পেতে। কে জানে, হয়তো সত্যজিৎ রায়ের 'বাক্স রহস্যের' মতো ফেলুদার শরণাপন্ন হতে হত।

এমনি করেই কলেজের বর্ণময় পাঁচটা বছর এক সময় শেষ হল, বন্ধুবান্ধবরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলাম দূরে দূরে যে যার ক্যারিয়ার নিয়ে। আমি চলে এলাম অনেক, অনেক দূরে। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বিদেশে। উচ্চতর শিক্ষার জন্য। এখনও মনে পড়ে দেশ ছেড়ে রওনা দেবার আগের কয়েকটা সপ্তাহের কথা। মনে রোমাঞ্চের শিহরণ, তার সঙ্গে একটা অজানা ভয়। পারব তো? পারব তো? এই সময় কয়েকটা রবীন্দ্রসংগীত খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল আমার, সারাক্ষণ ক্যাসেটে শুনতাম আর গুনগুন করতাম। দেবব্রত বিশ্বাসের গলায় "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী", চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের গলায় "এবার আমার ডাকলে দূরে, সাগরপাড়ের গোপন পুরে" আর অর্ঘ্য সেনের গলায় "অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে"। তখন প্রায় প্রতিদিন আত্মীয়-পরিজনেরা দেখা করতে আসছে শুভেচ্ছা আর নানা উপহার নিয়ে। একদিন দিদি-জামাইবাবু এল – হাতে কয়েকটা প্যাকেট (দিদির তখন সদ্য সদ্য বিয়ে হয়েছে)। খুলে দেখি তার মধ্যে একটায় অখণ্ড গীতবিতান – রেক্সিনে বাঁধানো। শুধু তাই নয়, প্রথম পাতায় দিদি গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছে, "বাহ্যিক সম্পদ আর আড়ম্বরের দেশে এই অমৃতভাণ্ড তোমার অন্তরকে চিরসমৃদ্ধ করে রাখুক"। আজ এতো দশক পরে এই লেখা যখন লিখছি, সেই বই রয়েছে আমার ঠিক পাশেই – আমার টেবিলের ওপর। আমার কলেজ জীবনের স্মৃতিজড়ানো পকেট গীতাঞ্জলিও রয়েছে তার সঙ্গে। গত কয়েক দশকে আমার আর কোন কোন সফরে সঙ্গী হয়েছে ওরা দুজন – সেই গল্প অন্য কোথাও, অন্য কখনো শোনাব। আপাততঃ শুধু তাদের স্রষ্টার উদ্দেশে এই বলে শেষ করি যে, "আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান / তুমি জানো নাই, তুমি জানো নাই তার মূল্যের পরিমাণ"।

সুজয় দত্ত – ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।

অন্বেষা দত্ত

কবির পোশাক চিন্তন

"অমিত বলে, ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী।" রবি ঠাকুরের "শেষের কবিতা"-র এ সংলাপ বহুচর্চিত। তবে বহু-অনুভূত কি না, প্রশ্নসাপেক্ষ। এ প্রশ্ন ওঠে সততই কারণ এ উপন্যাস প্রকাশের ৯৪ বছর পেরিয়েও স্টাইল আর ফ্যাশনের পার্থক্য আমাদের বোধে ধরা পড়েনি। কবিপক্ষে কবিপুজোর ঘটা থাকে। তাঁর হাজারো ছবি চোখের সামনে ধরা পড়ে। তবু, দেখেও যেন দেখি না তাঁকে।

তাঁর স্টাইল অনুকরণ বা অনুসরণ করলে বাঙালির স্মার্টনেস রাতারাতি বৃদ্ধি পাবে, এমন প্রতিশ্রুতি খোদ কবিও দিয়ে যাননি। কিন্তু দেখার চোখ তিনি তৈরি করতে কম কসুর করেননি। এ আমাদের দুর্ভাগ্য যে সেই সময়ে দাঁড়িয়ে তাঁর পোশাক-চিন্তন যে মাত্রা ছুঁয়েছিল, তার খুব সামান্যই আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি। যার ফলে ক্ষণস্থায়ী ফ্যাশনের পিছনে দৌড় এখনও অব্যাহত। সে ফ্যাশন এ অঙ্গে আদৌ সইবে কি, সে জিজ্ঞাসা থেকে আমরা শতহস্ত দূরে। আর নিজস্ব স্টাইল তৈরি করার মতো সময় বা ভাবনা আমাদের ব্যস্ত হাতে নেই তেমন। ভাবনার সঙ্গেই জড়িয়ে সৃষ্টিশীল মনন। পোশাক নিয়ে বাড়াবাড়ি যেমন প্রয়োজন নেই, তেমন পোশাক সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ থাকাও কাজের কথা নয়।

শৈশবে সাজপোশাক নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসত তাঁদের ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়।" সে সময় ঠাকুর পরিবারের আর্থিক সঙ্গতির কথা মাথায় রাখলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। "বয়স দশের কোটা পার হইবার পূর্বে কোনওদিন কোনও কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ... আমাদের চটি-জুতা একজোড়া থাকিত। কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নয়।" পোশাক নিয়ে সেভাবে কবে ভাবতে শুরু করলেন কবি? এর কোনও দিনক্ষণ ওভাবে বলা যায় না ঠিকই। তবে তাঁর লেখাতেই পাওয়া যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে হিমালয়যাত্রার সময়কালে তাঁর পোশাক নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হয়েছিল। "আমার বয়সে এই প্রথম আমার জন্য পোশাক তৈরি হইয়াছে। কী রঙের কী রূপ কাপড় হইবে – পিতা স্বয়ং আদেশ করিয়া দিয়াছেন। মাথার জন্য একটা জরির কাজ করা গোল মখমলের টুপি হইয়াছিল।"

এ তো না হয় গেল শৈশব কৈশোরের কথা। কিন্তু যে পোশাকে সুপুরুষ কবিকে দেখতে আমাদের চোখ ক্রমে অভ্যস্ত হবে, সেই সব পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর নিশ্চয়ই কোনও না কোনও ভাবনা ছিল। তা না হলে সময়ের বিপরীতে গিয়ে একটি ব্যতিক্রমী ধারা তিনি তৈরি করতে পারতেন না। আর সে ধারা এত জনপ্রিয়ও হতো না। তাঁর এই বস্ত্র-বয়ান শুধু অভিজাত মহলের চোখে ধরা পড়েছিল, এমনটা ভাবলে ভুল হবে। জোব্বা পরিহিত রবি ঠাকুরের ঋষিতুল্য সন্ন্যাসী বেশ (যেন বা যিশুর প্রতিমূর্তি) তাঁর জমিদারির প্রজাদের মনেও এক অদ্ভুত সম্ভ্রম জাগাত।

জোব্বার ধরনটা কেমন? অনেকটা সিকিমের বাকু, ভুটানের ঘো আর জাপানের কিমোনো মেশালে যা হয়। এ পোশাকের মূল কথা আরাম। হ্যান্ডলুম কাপড়ে তৈরি হতো। আর অদ্ভুত সুন্দর সব মাটি রঙা শেড। চোখের আরাম তো বটেই, জোব্বায় স্বস্তি পাওয়ার আর একটি কারণ, সহজে শরীরটা গরম রাখা যেত। ভারতীয়ত্বের ছোঁয়া মেশা এ পোশাক এতটাই স্মার্ট যে বিদেশেও এতে এতটুকু বিসদৃশ লাগত না। এক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ ক্রেডিট অবশ্যই বিশ্বকবির। যেমন-তেমন লোকে পরলে জোব্বা নিয়ে এত আলোচনা উঠতই না হয়তো। সুপুরুষ দীর্ঘকায় মানুষটির সাদা দাড়ি আর জোব্বা পরিহিত চেহারাটি আমজনতার মনে গেঁথে আছে। এ পোশাকের মধ্যে ভারতীয়ত্বের ছোঁয়া

আছে পূর্ণ মাত্রায়। যেটা কবির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমবার বিলেত যাত্রার সময় বিদেশি সাজ পরতে হলেও যত বয়স বেড়েছে, তিনি নিজের পোশাকের আদল ভেবে নিয়েছেন নিজেই। মুসলমান দর্জি হাতেকলমে তা বানিয়ে দিলেও জোব্বার নকশার সত্ত্ব কিন্তু তাঁরই হাতে। বয়স যত বেড়েছে, তাঁকে নানা মেটেরঙা অথবা সাদা জোব্বাতেই দেখা গিয়েছে বেশি। সঙ্গে বড়জোর মাথা বাঁচানোর জন্য টুপি।

প্রচলিত আরও একটি মত শোনা যায় পোশাক বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে। সেটি হল পায়ে এলিফ্যান্টিয়াসিস হওয়ার কারণে পদযুগল লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার জন্য জোব্বা আপন করেছিলেন কবি। তবে এ তথ্য প্রশ্নাতীত নয়।

রবির পোশাক-ভাবনা একদিন যে স্বতন্ত্র এবং স্বকীয় রূপ পাবে, তা বোধহয় লেখা ছিল ঠাকুরবাড়ির পুরুষদের পোশাক বেছে নেওয়ার ধরনেই। সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে নয়, এ বাড়ির পুরুষরা তৈরি করেছিলেন পৃথক পোশাক পরিচয়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুরনো ছবি ঘাঁটলে পাওয়া যায়, তাঁর পরনে জরির কাজ করা মখমল জোব্বা আর সঙ্গে জমকালো কাশ্মীরি শাল। ধুতি মূলধারার পোশাক হিসেবে পরিচিত হলেও ঠাকুরবাড়ির অন্দরে ছিল পরিহান ও পাজামার পরশ। আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুক্তো বসানো মখমলের জুতো পরার গল্প তো সর্বজনবিদিত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা থেকেই জানা যায় সে সময়ের কথা। বিপুল পরিমাণ পিতৃঋণ শোধ করার পরে জমিদারির অবস্থা তেমন ভালো নয়। সেই পরিস্থিতিতে জলসায় যাওয়ার আমন্ত্রণ পেলেন মহর্ষি। এদিকে ঠাকুরবাড়ির সেই আর্থিক পরিস্থিতির কথা শহরের উঁচু মহলে খুব একটা লুক্কায়িত নেই। এই অবস্থায় দেবেন ঠাকুর কেমন সাজগোজ করে আমন্ত্রণ রক্ষা করবেন তা দেখার অতিরিক্ত আগ্রহ ছিল অনেকেরই। বিষয়টি নিয়ে চর্চার খবর রবি ঠাকুরের বাবার কানেও পৌঁছল। তিনি সকলকে বাকরুদ্ধ করে দেওয়ার মতো একখানা কাণ্ড করলেন। পোশাক বাছলেন একেবারে সাদামাটা। জরির কাজ করা মখমলের জমকালো পোশাক-আশাক যখন যুগের হাওয়া, তখন দেবেন্দ্রনাথ পরলেন একেবারে সাধারণ সাদা ধুতি পাঞ্জাবি। মাথায় কাপড়ের পাগড়ি অবশ্য ছিল। জলসায় তাঁর সাজ দেখে তামাশাপ্রিয় লোকেরা প্রথমে হেসেছিল বটে। কিন্তু মহর্ষির পায়ের দিকে তাকিয়ে তাঁদের মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল এক পলকে। মুক্তো বসানো দু'পাটি মখমলের সেই জুতোই বুঝিয়ে দিয়েছিল ঠাকুরবাড়ির শৌখিনতা আর আভিজাত্য ঠিক কোন তারে বাঁধা। এ প্রসঙ্গে শোনা যায়, দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু শোভাবাজারের রাজা বলেছিলেন, "একেই বলে বড়োলোক। আমরা যা গলায় মাথায় ঝুলিয়েছি ইনি তা পায়ে রেখেছেন।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অর্থাৎ নতুন দাদার প্রথাভাঙা সাজও অনেকাংশে প্রভাব ফেলেছিল কবির মনে। তাই সাজে একদিকে ছিল ইউরোপীয় ছোঁয়া ও আর একদিকে নবাবি কেতা। তাঁর নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলতে গিয়ে কবি লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন পরিচ্ছদ কী হইতে পারে এ বিষয়ে জ্যোতিদাদা তাহার নানা প্রকার নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করেন। ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে, অথচ পায়জামা বিজাতীয়, এইজন্য তিনি এমন একটা আপোষ করিবার চেষ্টা করিলেন, যেটাতে ধুতিও ক্ষুণ্ন হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না।" সেই সাজের বিবরণও দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ – "তিনি (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির মিশাল করিয়া এমন একটা পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। ... জ্যোতিদাদা এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি, সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত। তিনি ভ্রুক্ষেপ মাত্র করিতেন না।" পরবর্তীকালে এই স্টাইল কবি নিজে অনুসরণ না করলেও নিজের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী পোশাক তৈরির মতো বলিষ্ঠ ভাবনা তাঁর এসেছে জ্যোতিদাদার প্রভাবেই।

১৯৩১ সালে জার্মানিতে একটি ছবিতে কবিকে দেখা যায় তাঁর জোব্বার উপরে রয়েছে একটা গাঢ় রঙের লং কোট। জোব্বার সঙ্গে যেটি খুবই মানানসই। তার উপরে চোখে পড়ার মতো ঝোলানো চেনে বাঁধা চশমা। এই কালো জোব্বা আর লং কোটের সঙ্গে অসাধারণ বৈপরীত্য নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

নিজের পোশাক সম্পর্কে সচেতন যেমন ছিলেন, তেমনই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের নির্মাণের ক্ষেত্রে পোশাক নির্বাচনে কিছু কম নজর ছিল না কবির। কোনও চরিত্রের ব্যক্তিত্ব নির্ধারণে পোশাকেরও যে কার্যকরী ভূমিকা থাকে, সে কথা অবশ্যই মাথায় রাখতেন কবি। তাঁর সমসময়ের ছাপ পড়েছে সে বর্ণনায়। শুরুতে বলেছিলাম "শেষের কবিতা"র অমিতের কথা। ফিরে আসা যাক সেখানেই।

অমিতের চরিত্র বর্ণনায় কী বলছেন ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ? "অমিতের নেশাই হল স্টাইলে। কেবল সাহিত্য-বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে – পাঁচজনের মধ্যে ও যে-কোনো একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম; অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়িগোঁফ-কামানো চাঁচা-মাজা চিকন শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্তি-ভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না; .... দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা পরে না। ধুতি সাদা থানের, যত্নে কোঁচানো, কেননা ওর বয়সে এরকম ধুতি চলতি নয়। পাঞ্জাবি পরে, তার বাঁ কাঁধ থেকে বোতাম ডান দিকের কোমর অবধি, আস্তিনের সামনের দিকটা কনুই পর্যন্ত দু'ভাগ করা; কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জরি-দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে, তারই বাঁ দিকে ঝুলছে বৃন্দাবনি ছিটের এক ছোটো থলি, তার মধ্যে ওর ট্যাঁক-ঘড়ি, পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ-করা কটকি জুতো। বাইরে যখন যায়, একটা পাট-করা পাড়-ওয়ালা মাদ্রাজি চাদর বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুলতে থাকে; বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানি লক্ষ্ণৌ টুপি, সাদার উপর সাদা-কাজ-করা। ... নিজেকে অপরূপ করার শখ ওর নেই, কিন্তু ফ্যাশানকে বিদ্রূপ করবার কৌতুক ওর অপর্যাপ্ত। ..." পোশাক বর্ণনার এমন নৈপুণ্য এবং পারিপাট্য নিমেষে চরিত্রটিকে পাঠকের সামনে এনে দাঁড় করায় তো বটেই। অন্যদিকে বোঝা যায়, কবির সুচারু ভাবনা কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

লাবণ্যর প্রথম বর্ণনাতেও একই পারিপাট্য। চরিত্র গড়ে তোলায় সেটা কতটা সহায়ক হয়েছে পড়লেই বোঝা যায়। "মেয়েটির পরনে সরু-পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। ... প্রশস্ত ললাট অবারিত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁচ করে বাঁধা ... জ্যাকেটের হাত কব্জি পর্যন্ত, দু'হাতে দু'টি সরু প্লেন বালা। ব্রোচের-বন্ধন-হীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠেছে, কটকি-কাজ করা রুপোর কাঁটা দিয়ে খোঁপার সঙ্গে বদ্ধ।"

এ দু'টি নিমিত্ত মাত্র। তাঁর হাজারো সৃষ্টির মধ্যে এমন রাশি রাশি বর্ণনা খুঁজে পাবেন পাঠক। পোশাক ভাবনায় উজ্জ্বল কবিকে খুঁজে পেতে এতটুকু অসুবিধা হবে না সেখানে।

অন্বেষা দত্ত – গল্পকার ও গদ্যকার। বর্তমান পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত এবং "সুখী গৃহকোণ" পত্রিকাটির সম্পাদিকা। বহু জায়গায় গদ্যকার হিসেবে আমন্ত্রিত।

সুরজিৎ রায়

আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশচিন্তা ও রবীন্দ্রগান

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে বিশ্বজগতের অচেতন পদার্থ ও জীবজগতের আর নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। এই যোগাযোগের কথা আমরা কোন মতে অস্বীকার করতে পারি না। এই যোগাযোগের কথা অস্বীকার করতে না পারলেও প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ জীবজগতের যে নিবিড় যোগাযোগ শিথিল হয়ে যাচ্ছে এই যন্ত্র সভ্যতার যুগে তা আমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছি। অর্থাৎ জীবজগৎ ও প্রকৃতির মধ্যে যে ভারসাম্য বজায় থাকে তা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে প্রতিমুহূর্তে আমাদের বিশ্বজগতে ধেয়ে আসছে নানা ধরনের নানাবিধ বিপর্যয় এবং বিপত্তি। এর ফলে জীবজগৎ, প্রাণীজগৎ, সৌরজগৎ ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা যেন তার সঠিক মূল্যায়ন আজও করে উঠতে পারিনি। বুঝিনি তার মাধুর্য, বুঝিনি তার মানসিকতা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্বপ্রকৃতির সেই বিচিত্র অমৃত মধুর মানসিকতাকে তাঁর জন্য অনন্য অলৌকিক সৃজনী ক্ষমতা, পরিণত ও প্রকৃত চেতনাবোধ দিয়ে। তাই তিনি এই বিস্ময় – বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতিকে সশ্রদ্ধ চিত্তে, সাদরে ও সর্বান্তকরণে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছেন তাঁর সংগীত-সাহিত্য-শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে।

বিশ্ব প্রকৃতির বিচিত্র রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, সৌরভ অলক নদী বনে-উপবনে প্রভৃতি এই অপার সৌন্দর্য আমাদের জীবনকে প্রাণময় ছন্দময় গীতময় মধুময় করে তুলেছে। অথচ আমরা এর সঠিক মূল্যায়ন আজও দিতে পারি নি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতির এই বিচিত্র রূপ রস গন্ধ বর্ণকে তার অলৌকিক সৃজন ক্ষমতা ও প্রকৃতির চেতনা বোধের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। বিশ্ব প্রকৃতির চিরন্তন সত্যকে তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর অমর সঙ্গীতের কাব্য সুর ভাবে মিলিত ঝর্ণাধারায় উচ্ছ্বসিত আবেগের মধ্য দিয়ে। ছয়টি ঋতু, বিচিত্র বিচিত্র রূপ ধরে তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিবর্তনশীলতার প্রতিটি সূক্ষ্ম মুহূর্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রকৃতি পর্যায়ের ঋতু সংগীতগুলির মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির গান দিয়ে তাই বিশ্বপ্রকৃতিকে বন্দনা করেছেন। বিশ্ব প্রকৃতির চরণে নিবেদন করেছেন তাঁর ঋতুর গানের ডালি।

প্রকৃতিপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবতার মেলবন্ধন করতে চেয়েছিলেন বলেই শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন। পুঁথিগত বিদ্যাজ্ঞানের হাত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের রেহাই দেবার জন্য এমন একটি সাংস্কৃত ও পরিমার্জিত আনন্দময় শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যেখানে খুব সহজেই প্রকৃত জ্ঞান ও বিদ্যার আদান-প্রদান ঘটবে। তাই তিনি ছোটদের গাছের তলায় বিদ্যা পাঠের আদান-প্রদান চালু করেছিলেন, যেন প্রকৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে এই মূল লক্ষ্যকে বজায় রেখে।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ সুচনা করলেন বৃক্ষরোপন ও হলকর্ষণ উৎসব। এই দুটি উৎসবই বর্ষামঙ্গলের অঙ্গ। শান্তিনিকেতন ও তার আশপাশ একসময় ছিল বৃক্ষবিরল শ্রীহীন প্রান্তর আর লাল কাঁকুড়ে ঢেউ খেলানো ধূসর খোয়াই। পারিপার্শ্বিক রুক্ষভাবে বৃক্ষলতা পুষ্পে শ্রীমন্ডিত করে তোলার কল্পনায় কবি বৃক্ষরোপণ উৎসব প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এই শ্রীহীন রুক্ষ প্রান্তরকে বৃক্ষ-লতার মাধ্যমে পুষ্পমন্ডিত করে তোলার উদ্দেশ্যেই **১৯২৮** সালের **২১** শে জুলাই রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেন বৃক্ষরোপণ উৎসবের। বর্তমানে **১৯৪১** সালে কবিগুরুর মহাপ্রয়াণের পর **১৯৪২** সাল থেকে বাইশে শ্রাবণ কবিগুরুর তিরোধান দিবসের দিনে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর পরিচালনায় এই বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। শুধু তাই নয় একটি ভাবার বিষয়ও আছে এখানে। একটি ছোট চারা গাছকে উৎসবের দিন সুসজ্জিত চতুর্দোলায় বসে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় আর দুটি বৃহৎ আকারের বাঁশের ছাতাকে ফুল ও কাঁঠাল পাতার দ্বারা সাজিয়ে চারা গাছটির উপর ধরা হয় যাতে রোদ না লাগে ও শোভাযাত্রার শোভাও বৃদ্ধি পায়।

আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে গেলে তার পরিবেশচিন্তাকে কোনভাবেই আলাদা করা যায় না। শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋতুতে যে উৎসবের সমাগম হয় তার মাধ্যমে শান্তিনিকেতন ও তার আশেপাশের সমস্ত গ্রামাঞ্চল ও পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন এলাকার মানুষজন তাদের জীবিকানির্বাহ করে থাকে। বিশেষত শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরিপল্লীতে যে বিশেষ বেচাকেনার হাটের সমাগম হয় তাতে বিভিন্ন এলাকার মানুষ বীরভূম ও শান্তিনিকেতন এলাকার বিশ্বের শিল্পকর্মের পসরা সাজিয়ে বসে ও আর্থিকভাবে লাভবান হয়। তাছাড়াও বসন্ত উৎসবের মতো অনুষ্ঠানে যে লোকসমাগম হয় তাতে এলাকার মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা দেখা যায়। তাছাড়াও ৭ই পৌষ উপলক্ষে যে পৌষমেলা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতেও তার প্রভাব পড়ে। আমরা জানি মানুষের হাতে টাকা আসলে ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে। সুতরাং সর্বোপরি শান্তিনিকেতনের পর্যটন শিল্প এবং আর্থিক আদান-প্রদানের যে মেলবন্ধন তার মাধ্যমে শুধুমাত্র এত শ্রেণীর দরিদ্র মানুষজনই যে উপকৃত হন তাই নয়, বিশ্বজগতের দরবারে শান্তিনিকেতনের একটি অন্যতম সাংস্কৃতিক নিজেকে মেলে ধরে।

এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ সেই বহু বছর আগে এই অনুষ্ঠানগুলি চালু করেছিলেন এই সময় দাঁড়িয়ে সেগুলি কতটা প্রাসঙ্গিক। বর্তমানে বিশ্ব প্রকৃতির যে ভয়াবহ রূপ প্রতিনিয়ত আমরা পরিলক্ষিত করছি তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের পরিবেশচিন্তা এবং রবীন্দ্রসংগীতের মেলবন্ধনের বাস্তবায়ন ঘটানো খুবই প্রাসঙ্গিক। শুধুমাত্র পরিবেশচিন্তাকেই গুরুত্ব দেওয়া নয় এর সঙ্গে যদি তাঁর আর্থসামাজিক দিকটিকেও জোর দেওয়া হয় তাহলে পরিবেশের পাশাপাশি মানুষের জীবিকা নির্বাহের দিকটিও সমানভাবে গুরুত্ব পাবে। "একটি গাছ একটি প্রাণ" – এই কথাটিকে আদর্শ করে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও চিন্তাভাবনা বাস্তবায়ন করার সময় এসেছে।

Surajit Roy Assit. Professor, Visvabharati Santiniketan, Sangeet Bhavana, Dept. of Rabindra Sangeet. Doctorate in Rabindra Sangeet. An eminent Esraj player as well as a rabindra sangeet singer. Dr. Roy took part so many prog. and seminars all over the world.

পারিজাত ব্যানার্জী

শ্রাবণের ধারার মতো

১) পরশুরাম

পরশুরামের গত বৈশাখে পঁচাত্তর হল। তাঁকে দেখে অবশ্য তাঁর সঠিক বয়স আন্দাজ করা ভার। গত চল্লিশ বছর ধরে গোলপার্কের পেট্রোল পাম্পটা পেরিয়ে রোলের দোকানের আগের যে ছোট্ট চা'য়ের গুমটিটা আছে, ওটারই মালিক পরশুরাম। চল্লিশ বছর ধরে খেটে কষ্ট করে দোকান চালালে কি হবে, প্রায় একই রকম তবু রয়ে গেছে তাঁর চেহারা আর অমায়িক হাবভাব। পরশুরামের গায়ের রং শ্যামলা, তেল চপচপে; মাথার কাঁচা পাকা চুল পেতে পরিপাটি করে আঁচড়ানো। পরনে পরিষ্কার সাদা পাজামা পাঞ্জাবী; মুখে এক গাল হাসি। এভাবেই তাঁকে সব সময় দেখতে অভ্যস্ত তাঁর ক্রেতারা। তাঁর হাতের তৈরি চা'টাও বাকি চা'য়ের দোকানের থেকে আলাদা। কড়া, সুস্বাদু – শুধু চিনির গোলা নয়। চা'য়ের দোকান থেকে উপার্জন করে নিজের ছেলেকে একটি ছোট বেকারী খুলে দিয়েছেন। সেখান থেকেই গত প্রায় ২৫ বছর ধরে কেক আর বিস্কিটের সাপ্লাই আসে তাঁর দোকানে। সেগুলোও খাসা। এ নিয়ে কেউ প্রশংসা করলে অবশ্য পরশুরাম হাসেন। ঠিক আজকের মতোই মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলেন, "সবই ঠাকুরের ইচ্ছা।"

– "কোন ঠাকুর গো পরশুরামদা?"

– "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! ভাগ্য করে ওনার জন্মদিনেই জন্মেছি কিনা আমি! ২৫ শে বৈশাখ ... তাই ওনার মত লিখতে পড়তে না পারলেও কিছু গুণ তো পেতামই। কি বলেন!"

– "ও, তাই বুঝি তোমার দোকানে সব সময় রবি ঠাকুরেরই গান চলে!"

– "ঠিক ধরেছেন বাবু। ও সব কি আর শুধু গান ... কি কথা দেখি বলুন তো ওগুলোর! আমার কাছে তাই ওসব গান নয় শুধু, ঠাকুরের বাণী। আমি তাই তো কোনও ঠাকুর দেবতার মন্দিরে পর্যন্ত যাই না আর। শুধু নিয়ম করে শান্তিনিকেতন যাই। ওটাই আমার তীর্থ। "আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ!"

– "বউ ছেলেপুলে রাগ করে না তোমার এই হুজুগে?"

এক গাল হাসেন পরশুরাম। তাঁর সেই ভুবন ভুলানো হাসি। "বিয়ের পর নিরুপমাকে তো বলেই ছিলাম তোমার বাড়িতে বিয়ের সময় দেনা পাওনার কথা কেন বলিনি বলতো? সবই এই ঠাকুরের ইচ্ছায়, বুঝলে! তোমার নাম নিয়ে ওনার গল্প আছে। যবে থেকে শুনেছি ওটা, ওইসব সম্পর্কের মাঝে টাকাপয়সার লেনদেনে ঘেন্না ধরে গেছে। মেয়েকেও বিয়ে দিতে তাই অনেক কাঠখর পোয়াতে হয়েছে আমাদের। তা হোক, ঠিক পথে তো রইলাম। ছেলে মেয়েকেও শেখাতে পারলাম।"

"বাঃ ... তবে এই যে বললে, পড়াশোনা করোনি, তাহলে এসব গল্পের কথা জানলে কিকরে?"

– "তা কি জানেন তো বাবু। আমি পড়াশোনাটা না শিখলেও শুনে শুনে শিখে নিয়েছি ওসব ছোটবেলাতেই যখন মা আমায় খাওয়া পরার কাজে চৌধুরীদের বাড়িতে ঢুকিয়ে দিল। তখন আমার এই ১৬-১৭ বয়স। ওই বাড়ির ছোট ছেলে মাধ্যমিক দিচ্ছে। তার সাথে ছিল আমার খুব ভাব। সেই তো আমায় প্রথম চেনালো রবি ঠাকুরকে! এখন মস্ত বড় লেখক তিনি। আমার এই দোকানে নিয়ম করে চা খেতে ঠিক আসেন। তো যা বলছিলাম, তার কাছেই আমার এই সব গল্প শোনা। হাঁ হয়ে যেতাম আমি ওনার লেখাগুলো শুনে। কি সব গল্প! শাস্তি, দেনা পাওনা ... আহা! একমাত্র ওই সব সময়

জানেন খুব আক্ষেপ হতো। পড়াশোনাটা আমার হলো না বলে। তাই ছেলে মেয়ে দুজনকেই সাধ্যমতো পড়িয়েছি ওরা যাতে অন্তত ঠাকুরকে চিনতে পারে। আর আমি নিজে ঠাকুরের সেবা করে যাই নিজের মতো করে সৎ পথে থেকে এই বয়সেও কাজ করে। আর বাড়ির কথা কি বলব! আমার নাতনি তো আমার আগে ওনাকে দাদু বলে চিনেছে – ভাবতে পারছেন অবস্থাটা! ওদের উৎসাহে আমারও ঠাকুরের সাথে জন্মদিন হই হই করে পালন হয়। মেয়ে ফুলের মালা গাঁথে; ওর গানের গলাখানাও বেশ! এহে, দেখেছেন, কথায় কথায় আপনার চা'টাই জল হয়ে গেল একদম! আরেক কাপ চা দিই তাহলে? আর এই সন্দেশ বিস্কুটটা নতুন এসেছে। এটাও খান দুই চেখে দেখুন না, দুর্দান্ত!"

২) সঞ্চারী

সঞ্চারীর বছর দশেক বয়স। যদিও ক্লাসে তার বয়সি বাদবাকি আর পাঁচ জন মেয়ের থেকে চেহারাগত ভাবে সে বেশ বড়সড়, আলাদা। তার ভাসা ভাসা চোখ, ঠোঁটের নীচে তিল, এক ঢাল কোঁকড়ানো চুল ... কিন্তু এতসব রূপের গল্প তার বিষয়ে বলে লাভ কি, যখন সেই রূপ নিয়েই সঞ্চারীর কুণ্ঠা সবচেয়ে বেশী। সে নাচে, গান শেখে, আবৃত্তি করে, ছবি আঁকে, পড়াশোনাতেও বেশ ভালো ক্লাসে, অথচ যখনই কারো সাথে কোন অনুষ্ঠান বাড়িতে বা রাস্তায় তার দেখা হয়, কেমন ভাবে যেন তারা দেখে তাকে বাঁকা চোখে। তাকে মানে শুধু তার বাড়ন্ত শরীরটাকে। তার মা সাথে থাকলে তাঁকে উদ্দেশ্য করে কেউ কেউ তো বলেই দেন, "ও বাবা আমাদের সঞ্চু কত বড় হয়ে গেল! একেবারে লেডি তো! তবে একটা কথা বলব, কিছু মনে করিস না ভাই, দশ বছরে এত বড়সড় দেখালে না জানি পরে কি হবে? ওর খাওয়া দাওয়া এক্সারসাইজ রুটিন এসবে এখন থেকে একটু নজর দিস কেমন! ওর ভালোর জন্যই বলছি।"

বাকি যারা অতটা ভালো চায়না সঞ্চারীর, যেমন স্কুলের অন্যান্য মেয়েরা, তারা কখনো আড়ালে আবডালে কখনো মুখের ওপরেই তাকে "এই মোটা" "এই মুটকি" বলে ক্ষেপায়, হাসে।

ফিজিক্যাল এডুকেশনের টিচার টিটকিরি দেন, "সঞ্চারীর মতো থাম হতে না চাইলে রোজ সকালে উঠে দৌড়াবে সবাই কেমন!"

বাবা মাকে বলেন, "এক সাইজ বড় জামা বরং পরাও এবার থেকে সঞ্চুকে ... ওকে দেখতে ছোট লাগবে তাহলে।" বাবা বোঝেন না বিপদ রয়েছে তাতেও ... দোকানের কিডস সেকশনের কোন কিছুই তাহলে আর গায়ে উঠবে না সঞ্চারীর – অকালেই হারিয়ে যাবে তার শৈশবও!

এত কিছুর পরেও কিন্তু হার মানেনি সঞ্চারী। সে সুখী। তার কারণ তার মা, অহল্যা। তিনি আগলে রাখেন মেয়েকে তার সবটুকু দিয়ে। বলেন, "কে কি বলল, তাতে কিছু যায় আসে না। রবিঠাকুর কি আর একদিনে অমন বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন? তাঁকেও অনেক চড়াই উতরাই এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল কিন্তু আমার তোর মতোই। কতজনে কত কি বলতো তাঁকে, সমালোচনার নামে কিভাবে যে ছোট করা হয়েছে ওনাকে ... ঠাকুরবাড়ির ছেলে হয়েও ব্যবসাপত্রে মন নেই; স্কুলে যাননি, বাকি আর পাঁচজন সমবয়সী বাচ্চাদের থেকে তাঁর হাবভাব আলাদা, বড়লোক বলেই নোবেল পেয়েছেন উনি ... আরো কত কি! তাতে কি উনি গুমরে গুমরে কেঁদে বেড়িয়েছেন? একদমই না। বরং সব অপমানকে হেসে উড়িয়ে কি বলেছেন বলতো, বলেছেন, "আমার মুক্তি আলোয় আলোয়"।

সঞ্চারী জানালার গরাদে মাথা রেখে হাসে মায়ের কথায়। "তুমি কি করে জানলে, হয়তো বা উনি এতসব সহ্য করে শুধু এটুকুই লিখতে পেরেছেন 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে!' দেখছো না আমায়, আমিও তো খুব একা। আমি অন্যরকম বলে এই একলা চলা ছাড়া আর গতি নেই আমার।"

অহল্যা পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেন মেয়েকে। "আচ্ছা তুই একলা কই বল তো! তোর ঘরে 'সঞ্চয়িতা' রয়েছে – কবিগুরুর নিজে বাস করেন যার পাতায় পাতায় প্রতিটি শব্দে। তিনি তোর মত সব 'অমল' দের একা আর ছেড়ে দেন কই! একবার ডুব দিয়ে দেখ তো তাঁর মননে, দেখবি আর কক্ষণো একলা লাগছে না তোর নিজেকে। আর, তুই আলাদা মানেই তুই ফেলনা, এমন কথা আর কখনো মনে আনবি না কেমন!"

সঞ্চারী ঘুরে মায়ের বুকে মাথা রাখে। "বেশ, আনব না মা, তবে একটা শর্তে!"

অহল্যা মেয়ের মুখের দিকে তাকান। "কি শর্ত?"

"আমি 'অমল' হবো না কখনো। তবে যে আমাকেও খালি অপেক্ষায় থাকবে হবে কোনও দইওয়ালার নিজেকে খুঁজে পাওয়ার জন্য। আমি তার চেয়ে 'বীরপুরুষ' এর মতো বীর নারী হব কোনো। তোমার পাশে পাশে চলব 'রাঙা ঘোড়ার 'পরে!' ঠিক?"

অবাক হন অহল্যা। মেয়েটা সত্যিই এবার আর ছোটটি রইলনা। দেখতে দেখতে তাঁর চোখের সামনে যেন এক ধাক্কায় অনেকটা বড় হয়ে গেল রবি চেতনায়। মাথা নাড়েন তিনি। মনের মাঝে কবিগুরুকেই বোধহয় স্মরণ করে নেন আনমনে কিছুক্ষণ; তারপর বলেন, "তোর যা ইচ্ছা তাই করবি। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানো তোকে মানায় না। এরকমই থাকবি, স্বতন্ত্র।"

"রবি ঠাকুরের মত?"

"ঠিক। ওনার মতই, অন্যরকম। আলাদা।"

৩) অম্লান

অম্লান সামনের মাসে বেয়াল্লিশে পা দেবেন। এখনও ভাবতেই অবাক লাগে তাঁর এতগুলো বছর কেটে গেল জীবনের হিসাব-নিকাশ থেকে, অথচ গাধাকে দেখানো গাজরের মত সাফল্যের চাবিকাঠি কিন্তু এখনো তিনি কিছুতেই ধরে উঠতে পারলেন না। না, কোন অংশেই অম্লানকে কম সফল বা অমন কিছু বলা যাবে না। স্কুল কলেজ মোটামুটি প্রথম দিকের সারিতে থেকেই উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি বরাবর। চাকরিও সময়মতো পেয়েছেন একটি প্রখ্যাত আইটি কোম্পানিতে। খুব তাড়াতাড়ি বেশকিছু সিঁড়ি হড়বড় করে বেয়ে উঠে পাড়ি দিয়েছেন দেশের বাইরে আর্থ সামাজিক সমস্ত স্তর মেনেই। এখন বউ, বাচ্চা, বড় বাড়ি, গাড়ি নিয়ে যাকে বলে একেবারে সুখের সংসার তাঁর। অথচ তাও এই মধ্য যৌবনে পৌঁছে এখন অম্লানের মনে একটাই প্রশ্ন ফিরে ফিরে আসে বারবার – তিনি কি আদৌ ছুঁতে পেরেছেন সত্যিকারের সাফল্যকে?

আসলে, যত সময় পেরিয়েছে তাঁর জীবন থেকে, ততই থেকে থেকে সফলতার মানেটাও গেছে পাল্টে তাঁর ভাবনায় একটু একটু করে। ছোটবেলায় মনে হতো পড়াশোনা করলেই বুঝি সাফল্য মিলবে; তারপর মনে হল চেনা জানা সকলকে সবার আগে ডিঙিয়ে গেলে বোধহয় সফল হবেন তিনি। আরও পরে নানা সময় বিভিন্ন ভাবে বুঝলেন, ঠিকঠাক সম্পর্কের বাঁধনে জড়ালে কিংবা ছেলে বড় প্রাইভেট স্কুলে পড়লে অথবা প্রমোশন পেলে ... কিন্তু না কোনভাবেই তাঁর ভিতরের অম্লানকে প্রকৃত সফল বলে আজকাল আর চিহ্নিত করতে পারেন না তিনি। উল্টে এখন তাঁর মনে হয় সাফল্যের পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে কখন যেন নিজের থেকেই অনেকখানি শুধু সরে গেছেন তিনি। আয়নার সামনে দাঁড়ালে আর তাই নিজের ভিতরটাকে ঠাহর করতে পারেন না অম্লান। সেখানে তাই জমতে থাকে ব্যর্থতা আর একরাশ হেরে যাওয়ার যন্ত্রণা।

সত্যি কথা বলতে কি, অম্লান কোনোদিনই ঠিক চাকরি করে মোটা মাইনে ঘরে তুলে সফল হতে চাননি। চেয়েছিলেন কবিতা লিখতে। সামান্য কয়েকটা লাইনে নিজেকে প্রকাশ করার তাগিদ তাঁর ভিতর এতটাই ছিল যে লেখাকে ভেবেছিলেন নিজের জীবিকা করে বাঁচবেন। বাবা-মায়ের কোন কথাই শুনবেন না। স্কুলের বাংলা হেড স্যার উৎপলেন্দু বাবুর সঙ্গে এই নিয়ে কথাও বলতে গিয়েছিলেন তাই তিনি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ঠিক এক মাস আগে। "স্যার আমার লেখা তো আপনি পড়েছেন আপনি জানেন আমি কি লিখি কেমন লিখি। স্যার, আমি বাংলা নিয়েই পড়ে লেখালেখি করতে চাই। আপনি আশীর্বাদ করুন।"

ভ্রু কুঁচকে উঠেছিল বৃদ্ধের। "লেখালেখি? তা কবিতা না গল্প?"

– "আপাতত কবিতাই ভেবেছি, তবে ইচ্ছে আছে সব স্তরেই ঢু মারার। রবিঠাকুরের মতো। আসলে কি জানেন তো, আমার এই পথের পথিক বা গুরু, যাই বলুন না কেন, সবই আসলে উনি।"

– "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! তা ওনার মত জমিদারী আছে তো তোমার? কারণ বাংলায় লেখালেখিকে জীবিকা করে মানুষ কিন্তু খেতে পায় না; এটা মনে রেখো।"

– "বাংলা নিয়ে নিজে আপনি পড়াশোনা করে এই ভাবে বলছেন স্যার?"

– "হ্যাঁ, ঠিক। বাংলা নিয়ে পড়েছি বলেই বলছি এ রাস্তায় সাফল্য নেই। আমাকে দেখছো না। লেখালেখি আর কিছুই হল না। পরের স্কুলে শিক্ষকতা করেই দিন চলে গেল আমার। অঙ্ক বা ইংরাজি নয়, 'সামান্য' বাংলা পড়াই বলে সম্মানটুকুও পেলাম না। এই পথের পরতে পরতে খালি রয়েছে ব্যর্থতা। অম্লান, আমি তোমার মধ্যে নিজেকে দেখি বলেই বলছি, এ পথে হেঁটো না। খুব ভুগবে। আসলে কি জানো তো, রবি ঠাকুরের মতো সৃজনশীল মন আমাদের মধ্যে অনেকেরই থাকে। মিথ্যে বলব না, জানি, তোমারও আছে – কিন্তু ওনার মত মানুষ অত সুযোগসুবিধের মধ্যে বড় হয়েও বিশ্বাস করো অনেক কিছু সহ্য করেছেন সফল হওয়ার তাগিদে। তাঁরই চলার পথে যখন অত সমালোচনা, অমন বাধা; তুমি আমি তো সাধারণ মানুষ – আমাদের পথটা কিন্তু জেনে রেখো আরো বড় বড় ছুঁচলো পাথরে গাঁথা। এসব ছাড়ো, বাবা মায়ের কথা শুনে বরং ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হও। শখে লেখালেখি পাশাপাশি চালাতেই পারো দু-একটা বইও না হয় প্রকাশ করো, অসুবিধা নেই। কিন্তু এর মধ্যে নিজের জীবন সমর্পণ কোরো না। বাজে ভাবে হারবে।"

সেদিনের পরে অভিমানে আর শখেও লেখালেখি করেননি অম্লান। জীবনে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে বেছে নিয়েছিলেন নিরাপদ এগিয়ে চলার পথ। আজ এই মধ্য বয়সে পৌঁছে অম্লান হঠাৎ টের পেলেন, সফল হয়তো হয়েছেন তিনি এই পথে হেঁটে, কিন্তু নিজের সাধ, বাসনার জলাঞ্জলি দিয়ে সুখী হতে আর তেমন করে পারলেন কই তিনি!

ক'বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমস্ত লেখাগুলির পিডিএফ ডাউনলোড করেছিলেন অম্লান কোন এক সন্ধ্যায় হয়তো কিছুটা নেশায় বুঁদ হয়েই। ভেবেছিলেন অন্তত পড়ার চর্চাটা শুরু করবেন আবার। কিন্তু জীবনের ব্যস্ততায় আর কিছুটা হয়তো নিজের প্রতি অবহেলায় এতদিন এড়িয়েই গিয়েছিলেন অম্লান রবিঠাকুরের ওই অমোঘ পথ। কিন্তু ঝড় জলের এমন এক সন্ধ্যায় নিজের পড়ার ঘরে একা আবার হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতেই হঠাৎ তাঁর ভিতরে বদ্ধ থাকা আঠারো বছরের অম্লান ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। আর রবিঠাকুর যেন শুকতারা আর জোনাকির বুকে বসে ঠিক তখনই সেই কিশোরের ব্যথাকে নিজের গভীরে অনুধাবন করে লিখে ফেললেন আরেকটি অবিস্মরণীয় গান ... "শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে!"

(এভাবেই এখনও বাঙালির প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরেই অনেক অজানা মুহূর্তে জন্মান রবীন্দ্রনাথ – পঁচিশে বৈশাখের সেই শুভ ক্ষণের মতো করেই পরশুরামের, সঞ্চারীর অম্লানের বা আমার আপনার মননে। আজও তাই আট থেকে আশি কিছু না বুঝেই গেয়ে ওঠে থেকে থেকে, "হে নূতন! দেখা দিক আরবার, জন্মের প্রথম শুভক্ষণ!")

পারিজাত ব্যানার্জী – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক। ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে।

মধুবন চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ, ভাবসঙ্গীত ও রাগের সৌন্দর্য

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় রাগ-সংগীতের ভক্ত ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে রাগ রাগিনী ব্যবহারে তিনি অনুশাসনের বাঁধায় না পড়ে, তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে নতুন নতুন ধারায় ভাসিয়ে দিয়েছেন, সংগীতের অনন্ত যাত্রাপথে রাগরাগিণীর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন অত্যাশ্চর্যভাবে। যে রাগরাগিণীকে আমরা পেয়েছি, তানসেন, সদারঙ্গ, যদুভট্টের ধ্রুপদ, খেয়ালে, উচ্চাঙ্গসংগীতে কঠোর বন্দীশবাঁধা আরোহন, অবরোহনের সীমানার ঘেরাটোপে, তারাই আবার স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে মুক্ত আকাশে বিহঙ্গ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে। ঐতিহ্যের প্রথা ভেঙে এমন সব স্বরবিন্যাসের আমদানি করেছেন যা, প্রথাগতভাবে সম্ভব নয়। সেই মুন্সিয়ানা একমাত্র কবিগুরুই দেখাতে পেরেছিলেন সেই সময়। "সংগীতের উদ্দেশ্য" নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন – "যদি মধ্যম স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শোনায়, আর তাহাদের বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব না কেন ?" রাগারাগিণীর বিষয়ে আলোচনা করার সময় বলেছেন – "গানের কাগজে রাগরাগিণীর নাম নির্দেশ না থাকাই ভালো। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে। রূপের মধ্যে না। কোন রাগিণী গাওয়া হচ্ছে বলবার দরকার নেই। কি গাওয়া হচ্ছে সেইটাই মুখ্য কথা। নামের সত্যতা দশের মুখে, সেই দশের মধ্যে মনের মিল নাও থাকতে পারে"। অর্থাৎ রাগরাগিণীকে তিনি তাঁর সংগীতে ব্যবহার করেছেন ভাবের দ্যোতক হিসেবে। ভাবকেই ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছেন। ভাবের মধ্য দিয়েই রূপকল্প, চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন অর্থাৎ ভাব মুখ্য হয়ে উঠেছে। রাগ, ভাব প্রকাশের অবলম্বন হয়ে উঠেছে মাত্র। "ভৈরবী" রবীন্দ্রনাথের প্রিয় রাগগুলির মধ্যে অন্যতম। অসংখ্য গান রচনা করেছেন "ভৈরবী" রাগে। গান রচনা করলেও, রাগের অন্তর্নিহিত ভাবটি ফুটলো কি না, সে বিষয়ে তিনি অধিক নজর দিয়েছিলেন বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু কখনোও "ভৈরবী সংগীত" রচনা করতে চান নি। তাঁর রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র গান।

রবীন্দ্রনাথের অনুভবে "ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চির বিরহ বেদনা" ... অর্থাৎ ভৈরবী তাঁর কাছে এক বিশেষ অনুভূতি, শুধুমাত্র আলাপ নয়। ভৈরবী সম্পর্কে তিনি আরো বলেছেন – "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গম্ভীর কাতর করুণ রাগিনী উচ্ছসিত হয়ে উঠছে, সকালবেলাকার সূর্যের সমস্ত আলো লাল হয়ে এসেছে, গাছপালারা নিস্তব্ধ হয়ে কি যেন শুনছে, এবং আকাশ একটা বিশ্বব্যাপী অশ্রুর বাষ্পে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে" ...

রাগ ভৈরবী নিয়ে তাঁর মুগ্ধতা, উপলব্ধি আমাদেরকে অতীন্দ্রিয় এক জগতে নিয়ে যায়। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্তর সাধনা সম্পর্কে তিনি দিলীপ কুমার রায়কে বলেছিলেন – "হিন্দুস্তানি সংগীত ভালো করে শিখলে তা থেকে আমরা লাভ না করে থাকতেই পারব না। তবে এ লাভটা তখনই হবে যখন আমরা তাদের দানটা যথার্থ আত্মসাৎ করে তাকে আপনরূপ দিতে পারব। তর্জমা করে বা ধার করে সত্যিকার রস সৃষ্টি হয় না সাহিত্যেও না, সঙ্গীতেও না"। অর্থাৎ হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা বারবার আমরা দেখেছি। সংগীতের ধার এবং ভারকে তিনি গ্রহণ করতে বলছেন এবং অবশ্যই শেখার দিকটিও উল্লেখ করেছেন এবং না শিখলে যে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতের অপার সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্য থেকে আমরা বঞ্চিত হব সেটাও তিনি বলছেন। তবে তাকে অন্ধ অনুকরণ করার কথা তিনি বলছেন না, অনুসরণ করতে বলেছেন। রাগ-রাগিনীর ভাব বা রসটুকু গ্রহণ করে তাকে আপন রূপ দিতে বলছেন তিনি। লক্ষ্য করলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের দশ শতাংশ গান সম্পূর্ণরূপে রাগ নির্ভর। আর বাকি গানগুলি ৭৫ শতাংশর আবরণ বা সাজগোজ নির্ভর করছে রাগ প্রয়োগের উপরে।

তাই কবি বলছেন – "যতই দৌরাত্ম করি না কেন রাগ রাগিনীর এলাকা একেবারে পার হইতে পারি নাই। দেখিলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে কিন্তু বাসাটা তাদেরই বজায় থাকে"। রাগের কঠোর অনুশাসন নয়, অন্তর্নিহিত

যে ভাব ও রস, তাকেই তিনি গানের মধ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আর এখানেই তিনি অন্যান্য গীতিকারদের থেকে স্বতন্ত্র। তার এই অনুভবের নিদর্শন হিসেবে যে গানগুলির কথা বলা যায় সেগুলি হল –

"সকালবেলার আলোয় বাজে বিদায়ব্যথার ভৈরবী
সকরুণ বেনু বাজায়ে কে যায়"

আনন্দোজ্জ্বল গানগুলির মধ্যে একটি হলো "বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো ..."

আবার "পূরবী" রাগ নিয়ে তাঁর অনুভূতির কথা তিনি জানিয়েছেন এভাবে "পূরবী যেন শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন"। এই অনুভূতির প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ এই দুটি গান যেমন "অশ্রু নদীর সুদূর পারে" এবং "সন্ধ্যা হলো গো মা"। এই গান দুটিতে পূরবীর সঙ্গে ইমন রাগের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। এই গান দুটিতে ভাবের মুখ্যতা যেরকম আছে, পাশাপাশি সুরের ক্ষেত্রেও তিনি যে যথেষ্টই স্বাধীনতা দিতেন তা সুস্পষ্ট। শুধুমাত্র ভৈরবী, পূরবী বা ইমন বা যেকোনো একটি রাগকে কেন্দ্র করেই তিনি ভাবকে পরিস্ফুট করেছেন তা কিন্তু নয়, অনেক সময় দুটি রাগের মিশ্রণে বেশ কিছু গানও রচনা করেছেন। সেরকম গানের উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন, "চরণও ধ্বনি শুনি তব নাথ" – "সিন্ধু" ও "কাফি" রাগে নির্মিত। আবার "ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর" এই গানটি "ভায়রো" ও "ভৈরবী"র যুগলবন্দিতে গঠিত।

এখানে বলা যায়, তিনি পুরাতনকে নতুন করেছেন আবার নতুনকে আরোও নতুন করে দেখলেও, পুরাতনকে একেবারে বিদায় দিতে তিনি পারেননি। তাই প্রথা যেরকম ভেঙেছেন, আবার প্রথাকে আগলেও রেখেছেন সচেতন ভাবে, তার সব থেকে বড় উদাহরণ তাঁর রাগরাগিণী। নানা ভঙ্গিমায় লীলাবৈচিত্রে, নতুন চেহারায় আবির্ভূত হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত। রাগরাগিণীর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন ঠিকই, তবে সেখানে নতুন হাওয়া যেমন এনেছেন, আবার ঐতিহ্যের গন্ধ ফুরিয়ে যেতে দেননি। যেমন "পূরবী" রাগ। এই পূরবীর সুর শুনলে কবির মনে যে ছবি ভেসে ওঠে সে বিষয়ে "সংগীতের মুক্তি" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "পূরবী যেন শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন" ...

কিন্তু এ কথা কেন বললেন কবি? কেন পূরবীকে সন্ধ্যার বিষণ্নতার সাথে মিলিয়ে ট্র্যাজিক পূরবীকে দেখাতে চেয়েছেন? সূর্যদেবের অস্ত যাওয়ায় যে শূন্যতার পরিবেশ তৈরি হয় তার জন্যই কি এমন অনুভূতি তাঁর ? "ছিন্নপত্রাবলী"তে সন্ধ্যাকে "পূরবী" রাগের সঙ্গে এমন ভাবে মিলিয়েছিলেন যেন মনে হবে সন্ধ্যা যেন পূরবীর সঙ্গে এক বিকল্প সম্পর্কে বাঁধা। কবি "ছিন্নপত্রাবলী"তে বলছেন, "ইতিপূর্বে আমার মনে হচ্ছিল মানুষের জগতে এই 'সন্ধ্যা প্রকৃতি'র তুলনা বুঝি কোথাও নেই, যেই পূরবীর তান বেজে উঠলো, অমনি অনুভব করলুম, এও এক আশ্চর্য গভীর এবং অসীম সুন্দর ব্যাপার, এও এক পরম সৃষ্টি, সমস্ত ইন্দ্রজালের সঙ্গে এই রাগিনী এমনই সহজে বিস্তীর্ণ হয়ে গেল, কোথাও কিছুই ভঙ্গ হলো না, আমার সমস্ত বক্ষস্থল ভরে উঠলো ..."

কখনোও "পূরবী" তাঁর কাছে বিরহী হয়ে এসেছে, আবার কখনোও বা সন্ধ্যার রূপ নিয়ে। যদিও "বিধবা সন্ধার অশ্রুমোচন" এই বাক্যাংশটি যেন খুব রুঢ় বলে মনে হলেও পূরবী সবক্ষেত্রে যে অতি দুঃখের ভাব নিয়ে এসেছে তা মোটেই নয়, বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে "পূরবী" শিল্প সুন্দর গানই হয়ে উঠেছে। সাধারণত সন্ধ্যাকালীন রাগ হিসেবেই বিবেচিত হয় "পূরবী"। যদিও এই অনুমানের কোনোও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলে আমাদের জানা নেই। তবু "পূরবী" রাগের সঙ্গে সন্ধ্যা (সময়) এবং করুণ (ভাব) জড়িয়ে গেছে। কবিগুরু পূরবীকে কখনোও বীররসের (ভাব উৎসাহ) গানেও প্রয়োগ করেছেন। যেমন "শ্রান্ত কেন ওহে প্রান্ত"। কখনোও বলেছেন যে, "সময়ানুষঙ্গ বা ভাবানুষঙ্গ ব্যাপারটা শ্রবণাভ্যাসমাত্র" (গ্রন্থ: "সঙ্গীত ও ভাব" – রবীন্দ্রনাথ)

"সংগীত ও ভাব" প্রবন্ধে এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। রাগরাগিণীর ব্যাপারে ব্যাকরণের গোঁড়ামিকে উপেক্ষা করে তিনি তাঁর গানে তৈরি করেছিলেন বিমূর্ত ভাবনা। "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে" এই গানটির "মালকোষ"

রাগের রূপটিরও অনেকদিন পরে স্বরলিপিবদ্ধ হয়েছে। "বিশুদ্ধ মালকোষ" রাগের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের গানে কোথাও নেই বলা যেতে পারে। "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে" গানটির স্বরলিপিতে আছে "মিশ্র মালকোষ" রাগ।

রবীন্দ্রনাথের শাস্ত্রীয় রাগ ও জ্ঞানের যে কোনোও কমতি ছিল না বলাই বাহুল্য। তিনি যদুভট্ট, বিষ্ণু চক্রবর্তী ও অন্যান্য ওস্তাদদের কাছে রাগসংগীত শিক্ষা ও চর্চা করেছিলেন। এমনকি রাগ সংগীতের অনেক বন্দিশ ভেঙে প্রচুর গানও তিনি বাংলাগানের ভান্ডারে নিয়ে এসেছেন। শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুশাসন না মানলেও, সংগীতরীতিকে আয়ত্ত করেছিলেন।

তিনিই একমাত্র দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারতেন "পরম্পরাগত সংগীতরীতিকে আয়ত্ত করলে, তবেই নিয়মের ব্যত্যয় সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে", রাগ সঙ্গীতের পরম্পরাকে তিনি কখনো অগ্রাহ্য করেননি। তবে পাশাপাশি এটাও সত্যি যে তিনি ঠিক রাগসঙ্গীত সৃষ্টি করতে চাননি। চেয়েছেন গান। ছন্দের ক্ষেত্রেই শুধু সংগীতের মুক্তি চাননি, চেয়েছিলেন সুরের ক্ষেত্রেও। ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন –

"আমার আধুনিক গানে রাগ, তালের উল্লেখ না থাকাতে আক্ষেপ করেছিস। সাবধানের বিনাশ নেই ওস্তাদরা জানেন আমার গানে রূপের দোষ আছে তারপরে যদি নামেরও ভুল হয়, তাহলে দাঁড়াবো কোথায়"?

রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত হয়েছে ভৈরব ও ভৈরবীর মিশ্র প্রকৃতির রাগ। এই রাগ সম্পর্কে ভি ভি ওয়াঝালওয়ার তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতের "রাগ নির্ণয়" প্রবন্ধে যে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছিলেন, তা হল রবীন্দ্রনাথ যে গানগুলি ভৈরবী রাগে আরম্ভ করেছেন এবং পুনরায় ভৈরব রাগে ফিরে এসেছেন তাই এরূপ। গানগুলির রাগকে রবীন্দ্র ভৈরব বলা হবে। রবীন্দ্র-ভৈরব রাগ নিবন্ধ গানের মধ্যে দুটি হল "আমার জীবনপাত্র উছলিয়া মাধুরী" (প্রেম পর্যায়) ....

"ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের ও পাখি" এবং "যদি জানতেন আমার কিসের ব্যথা"

গানটির প্রথম পংক্তি বসন্ত মুখারী এবং পরবর্তী অংশ রবীন্দ্র ভৈরব রাগে।

আবার কিছু গান আছে, যেখানে ইমন ও পূরবীর সংমিশ্রণ আছে। ইমনের কাঠামোয় স্থান বিশেষে পূরবীর ছোঁয়া লেগেছে।

কোথাও ব্যবহার করেছেন শুদ্ধ ধৈবত, কোথাও বা শুদ্ধ ধৈবত যুক্ত পূরবী থেকে পূরবীর আদর্শ গড়ে তুলেছেন। কোনোও কোনোও ক্ষেত্রে কোমল ধৈবত এনেছেন। পূরবী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে অন্তর্নিহিত ভাব ব্যাখ্যা করেছেন যা পড়লে, মন্ত্রমুগ্ধের মতন পূরবীকে দেখা যায়, "কাল সন্ধ্যাবেলায় দূরের এক অদৃশ্য নৌকা থেকে বেহালা যন্ত্রে প্রথমে পূরবী এবং পরে ইমন কল্যাণে আলাপ শোনা গেল। সমস্ত স্থির নদী এবং স্তব্ধ আকাশ মানুষের হৃদয়ে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল"...

পূরবীকে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই ব্যবহার করেছেন দিনান্তের বা জীবন শেষের প্রান্তিক উদাসীনতার প্রকাশ হিসেবে। কাব্যসঙ্গীত রচনাই তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল। মনেপ্রাণে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, ভাব ও রূপকে। রাগের মিশ্রণ ঘটিয়ে রাগের সৌন্দর্যকে যেরকম প্রকাশ করেছেন, একই রকম ভাবে কথা ও সুরের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকেও প্রকাশ করতে পেরেছেন নিবিড়ভাবে।

আসল ভাবনাটা ছিল তার কিভাবে ভাবটিকে তার আবেগকে তার কল্পনাকে অবলীলায় মুক্তি দেওয়া যায় সুরের আকাশে। সেই ভাবনা থেকেই এত রাগ মিশ্রণ এত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। একদিকে যেমন তিনি পুরনো কাব্যে এনেছেন নতুন নতুন অলংকরণ তেমনি অন্যদিকে তার গানের সুরে আমরা দেখতে পাই পুরনো ছক ভাঙ্গা মৌলিকতা। দেখতে পাই বাদী, সম্বাদী স্থানে এসেছে বিবাদী স্বরের অকল্পনীয় সৌন্দর্য।

এই ধরনের রাগ মিশ্রণ রবীন্দ্র পূর্ববর্তী বাংলা গানে কেউ করেছেন কিনা সেটা নিয়ে ভাবার বিষয় আছে। হয়তো করেছেন কেউ, তবে তার সঙ্গে ভাবের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা সেটাও দেখতে হবে। অনেকবার দেখা গেছে ইমন, ভূপালী, বেহাগ, খাম্বাজ প্রভৃতির উল্লেখ প্রাচীন বাংলা গানের গ্রন্থাদিতে পাওয়া গেছে কিন্তু সেটা একেবারেই ভাব নিরপেক্ষ। তাছাড়া রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী লিরিকের ক্ষেত্রেও ভাবের এমন স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ সেভাবে দেখা যায়নি। পদাবলী কীর্তনে এক রাগ থেকে আর এক রাগে গমন দেখা গেছে, কিন্তু আকস্মিক স্বরের প্রয়োগ সে ভাবে ঘটেনি।

আসলে রবীন্দ্রনাথ চিরকাল জানার মাঝে এক অজানাকে খুঁজে গেছেন। এক অপার বিস্ময় তাকে ঘিরে থাকতো সবসময়। সেই মুগ্ধতা, বিস্ময়, ধরে রাখতে চেয়েছেন স্বরধ্বনিতে, রাগ রাগিণী বৈচিত্রে, কথায়, সুরে, ভাবে।

তথ্যসূত্র :–

- সংগীত সংজ্ঞার সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ – প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী
- সংগীত – তত্ত্ব রবীন্দ্র প্রসঙ্গ – শ্রী দেবব্রত দত্ত (সঙ্গীত প্রভাকর) – এলাহাবাদ
- রবীন্দ্র সংগীত ভাব ও রূপ – প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী

মধুবন চক্রবর্তী, জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়। সঙ্গীত শিখেছেন পণ্ডিত আচার্য জয়ন্ত বসুর কাছে। ফাইন আর্টস বিষয় নিয়ে স্নাতক হওয়ার পর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধ্রুপদ শাখায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর হন। দীর্ঘ দিন ধরে টেলিভিশনে সংবাদ পাঠিকা, কখনো অনুষ্ঠান সঞ্চালিকা হিসেবে কাজ করে চলেছেন। পাশাপাশি সাহিত্যেও রয়েছে সমান অনুরাগ। নিয়মিত লেখেন এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হয়ে থাকে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ। ইতিমধ্যেই প্রকাশ হয়েছে কয়েকটি একক কাব্যগ্রন্থ ও গবেষণা মূলক গ্রন্থ।

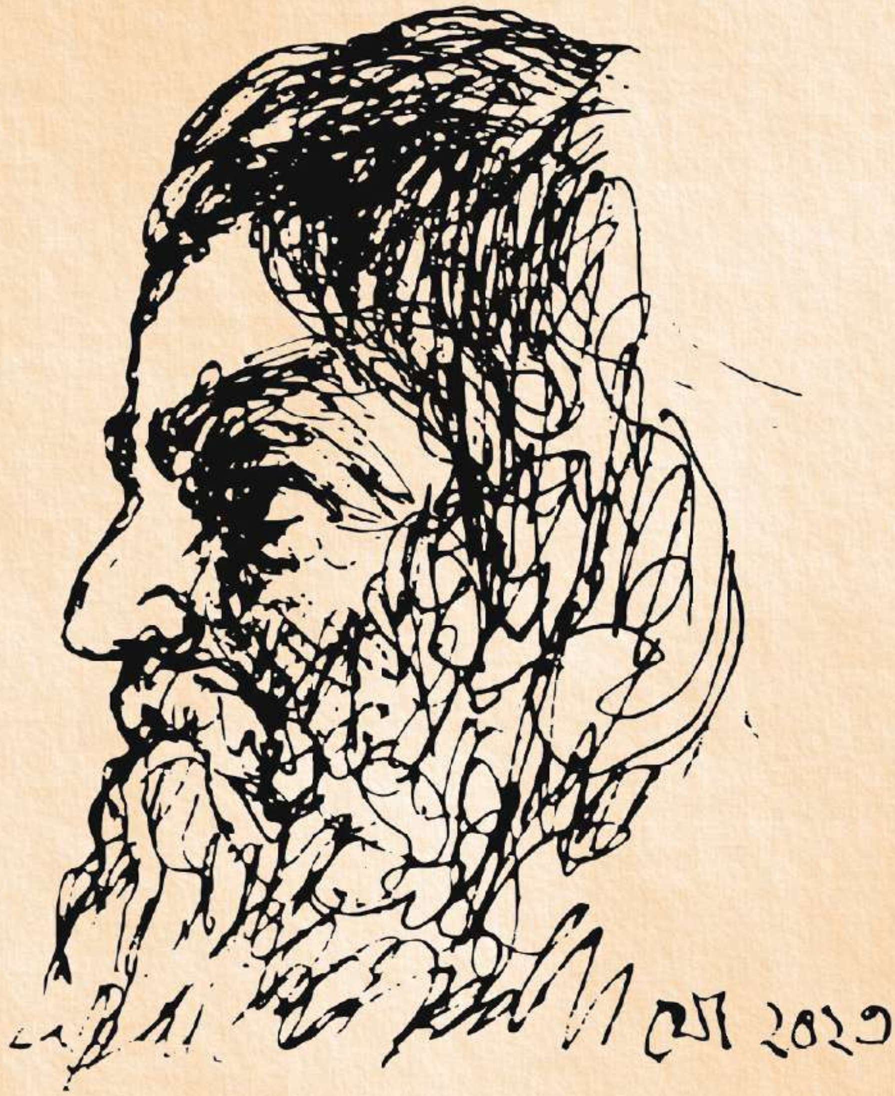

২০২৩ সালে প্রচ্ছদে বিখ্যাত শিল্পী শ্রী যোগেন চৌধুরী মহাশয়-এর আঁকা রবীন্দ্রনাথের ছবি “প্রভু আমার” রবীন্দ্রসংকলন’কে এক বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। বাতায়নের চলার পথে এই বিখ্যাত শিল্পীর আশীর্বাদ ও সহযোগিতা আমাদের পাথেয় ও বিশেষ অনুপ্রেরণা। বাতায়নের পক্ষ থেকে শ্রী যোগেন চৌধুরী মহাশয় কে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

প্রচ্ছদের এই ছবি বাতায়নের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে বাতায়নের পক্ষ থেকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই কবি শ্রী তন্ময় চক্রবর্তী কে ।

GITANJALI

103

IN one salutation to thee, my God, let all my senses spread out and touch this world at thy feet.

Like a rain-could of July hung low with its burden of unshed showers let all my mind bend down at thy door in one salutation to thee.

Let all my songs gather together their diverse strains into a single current and flow to a sea of silence in one salutation to thee.

Like a flock of homesick cranes flying night and day back to their mountain rests let all my life take its voyage to its eternal home in one salutation to thee.

— Rabindranath Tagore

9 780735 621534